প্রতিবিম্ব

শারদ স্মরণিকা-২০২৪

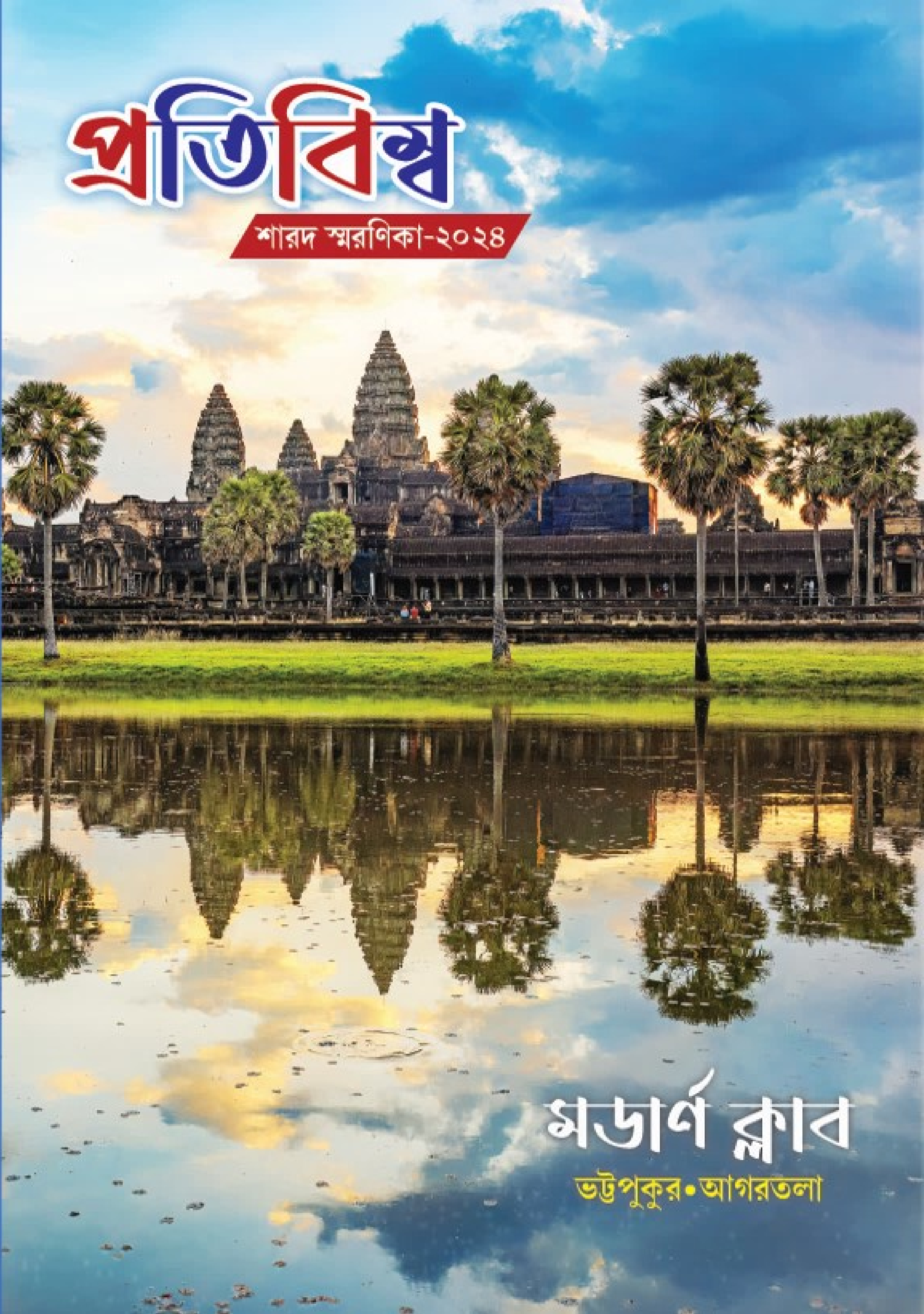

মডার্ণ ক্লাব

ভট্টপুকুর • আগরতলা

উৎসর্গ

রাজ্যে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় স্বজনহারা ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি

প্রতিবিম্ব-২০২৪

(১৪৩১ বঙ্গাব্দ)

মডার্ণ ক্লাব

নাগেরজলা • ভট্টপুকুর • আগরতলা • ত্রিপুরা (পশ্চিম)

"Pratibimba"

Saradiya Smaranika - 2024
Modern Club
Bhattapukur, Agartala, Tripura(West)
Ph: 9436482221

সম্পাদক

পার্থ সারথি দেব

উপদেষ্টা

শেখর দত্ত

প্রচ্ছদ পরিচিতি :

আঙ্কোরভাট পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হিন্দু মন্দির বলে পরিচিত।
দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্বোডিয়ার 'যশোধারাপুর' (বর্তমানে 'আঙ্কোর') এলাকায় মহারাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের তৈরী "আঙ্কোরভাট" আজও সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে, যা দেখার জন্যে পর্যটকরা আসেন সারা পৃথিবী থেকে। মডার্ণ ক্লাবের ২০২৪ সালের 'প্রতিবিম্ব' ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদের ছবিটি তুলেছেন বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী ত্রিপুরার ডাক্তার, স্বনামধন্য ফটোগ্রাফা স্বপন চৌধুরী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় মিহির চন্দ্র চক্রবর্তী

প্রাক্তন সভাপতি

মডার্ণ ক্লাব

জন্ম : ১১ জুলাই, ১৯৪৩   যাওয়া : ১৫ নভেম্বর, ২০২৩

ক্লাব সদস্য-সদস্যা ও এলাকাবাসীর হৃদয়ে
চির অম্লান থাকবেন আপনি

सत्यमेव जयते

ত্রিপুরা সরকার

মুখ্যমন্ত্রী
ত্রিপুরা সরকার

শুভেচ্ছা

অন্যান্য বছরের মত এবছরও আগরতলার ভট্টপুকুরস্থিত মডার্ণ ক্লাবের শারদ স্মরণিকা **'প্রতিবিম্ব'** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। উৎসবকে কেন্দ্র করে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন নিঃসন্দেহে আমাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যকেই সমৃদ্ধ করে।

উৎসব আমাদের জীবনের অনুষঙ্গ। আমাদের সমাজ জীবনের ধারায় উৎসবের আবাহন চিরকালের। কিন্তু এবারের উৎসব এসেছে এক ভিন্নতর পরিবেশে। বিধ্বংসী বন্যার করালগ্রাসে রাজ্যের বহু মানুষ আজও বিপন্ন। উৎসবের আলোকবর্তিকা তাঁদের অন্ধকারকে মুছে দিক। দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসবের আনন্দকে সকলে মিলে ভাগ করে নেওয়াই হোক এবারের শারদোৎসবের মূল আহ্বান।

সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে শারদ উৎসব আনন্দমুখর হোক এবং সকলের জন্য সুখ, শান্তি-সমৃদ্ধি ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসুক।

প্রফেসর ডা: মানিক সাহা

सत्यमेव जयते

ত্রিপুরা সরকার

উপাধ্যক্ষ,
ত্রিপুরা বিধানসভা

শুভেচ্ছা

দুর্গাপূজা ২০২৪ উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের সম্মানিত নাগরিকদের এবং সকল ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতি বছরের ন্যায় এই দুর্গাপূজাতে আপনাদের মডার্ণ ক্লাবের উদ্যোগে স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি এবং সাফল্য কামনা করছি। দুর্গাপূজা আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির অন্যতম প্রধান উৎসব। এই পূজা শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যেরও প্রতীক।

মা দুর্গার আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হোক। যারা এই পূজার আয়োজন করছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের প্রচেষ্টায় এই উৎসব আমাদের রাজ্যে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সৌহার্দ্যের বার্তা পৌঁছে দিক।

শুভ দুর্গোৎসব ২০২৪।

(রামপ্রসাদ পাল)

Mayor
Agartala Municipal Corporation

MESSAGE

I am very glad to learn that ***MODERN CLUB*** *is going to publish a souvenir* ***"PRATIBIMBA"*** *on the eve of* ***DURGA PUJA.***

A Magazine serves the organisation as its mouth piece by reporting its activities and achievements. It also publishes the contributions of its members. All these become fond memorabilia for everyone connected with the Organisation.

Besides, it also serves, very importantly, as the launching pad of the future writers and poets of repute.

I wish the magazine all success in all these activities appreciably well..

(Dipak Majumder)

কর্পোরেটর
আগরতলা পুর নিগম
৪০ নং ওয়ার্ড

শুভেচ্ছা

মডার্ণ ক্লাব আমাদের শহর দক্ষিণাঞ্চলের স্বনামধন্য একটি প্রধান ক্লাব। আমি জেনে আনন্দিত যে, শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও **'প্রতিবিম্ব'** মুখপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। আমি মনে করি এটা একটা সামাজিক দায়বদ্ধতাও বটে, কারণ সৃজনশীল ও সমৃদ্ধ লেখা সুস্থ মানুষ গড়তে সহায়ক হয় এবং সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরিতে সক্ষম হয়। নবীন-প্রবীণ ও প্রতিভাবান লেখক-লেখিকাদের কলমে এই স্মরণিকাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশা রাখছি। আপনাদের সংস্থার সকল সদস্য-সদস্যাসহ এলাকাবাসীর প্রতি আগরতলা পুর নিগেমর ৪০ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

উৎসবের দিনগুলি সকলের আনন্দমুখর হয়ে উঠুক এই শুভ কামনা রইল।

Sampa Sarkar (Chowdhuri)

সম্পা সরকার (চৌধুরী)

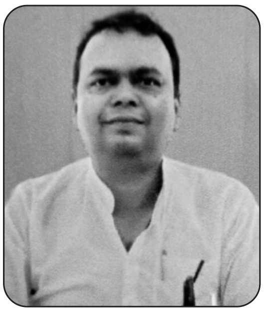

চেয়ারম্যান
দক্ষিণ জোন
আগরতলা পুর নিগম

শুভেচ্ছা

ঢাকের মন্ত্রমুগ্ধ আওয়াজ আরও একবার আমাদের জানিয়ে দেয় মা আসছেন। আশা করব মায়ের আগমন আপনার এবং আপনাদের জীবনে সুখ, শান্তি এবং ঐশ্বর্য নিয়ে আসবে।

আমি খুবই আনন্দিত প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারও শহর দক্ষিণাঞ্চলের বহু প্রাচীন এবং স্বনামধন্য ক্লাব **'মডার্ণ ক্লাব'** মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যার প্রতি রইল আমার অফুরন্ত ভালোবাসা, শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

অভিজিৎ মৌলিক

ক্লাব সভাপতির শুভেচ্ছা

আনন্দের বীণা বেজে গেছে, মায়ের আগমনের উৎসব মহাউৎসবে পরিণত হবে। এই সুন্দর আনন্দময় দিনগুলো আপনাদের সবার জন্য বয়ে আনুক অনেক অনেক মঙ্গলময়, শান্তিময়, সুখের ও সুস্বাস্থ্যময় জীবন।

এই আনন্দমুখর দিনগুলো এবং পুরো বছরের জন্য আপনাদের সবার প্রতি রইল আমার এবং মডার্ণ ক্লাবের সদস্য-সদস্যাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ।

প্রতিমা মানেই প্রতিটি 'মা' এর মধ্যে বিরাজমান 'মা দুর্গা'। চলুন আমরা সবাই মিলে এই মায়েদের সাথে হাত মিলিয়ে সমাজের সমস্ত কুচক্রী অসুর মনোবৃত্তি মানুষগুলোকে সমাজের কল্যাণের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনি।

মায়ের আশীর্বাদে 'আমি' এবং 'আমার' এই খোলস থেকে বেরিয়ে তুমি, তোমরা, আমরা, আমাদের, আপনাদের মধ্যে বিলীন হতে পারি এই প্রার্থনা মায়ের কাছে।

মডার্ণ ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষে (২০২৪-২০২৫) আমরা যে সমস্ত কর্মসূচি করে চলছি তাতে আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা কামনা করছি।

সবার প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সজল চক্রবর্তী
সভাপতি
মডার্ণ ক্লাব

ক্লাব সম্পাদকের বার্তা

কাশফুল জানান দিচ্ছে শরৎ এসে গেছে। শরতের সবুজ স্পর্শে, আকাশে সাদা রঙের ভেলা, শরৎ শুভ্র হাওয়া মায়ের আগমনীবার্তায় প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলেছে। এই সময় আমরা মায়ের বন্দনায় ব্রতী হওয়ার সাথে সৃজনশীল সাহিত্যেও গা ভাসাই। পুজোতে **'প্রতিবিম্ব'** আমাদের বাড়তি আকর্ষণ। প্রতি বছরই প্রকাশিত হচ্ছে মডার্ণ ক্লাবের শারদ স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব'। পাঠক মহলে দারুণ সমাদৃত হচ্ছে আমাদের এই শারদ স্মরণিকা।

এবার ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন চলছে। তাই এবারকার পুজো ও স্মরণিকা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত উদ্যোগ সার্থক করে তুলতে আমরা সবাই মিলে প্রচেষ্টা করছি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্লাব আরও এগিয়ে যাবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমার।

মডার্ণ ক্লাব শারদীয়া দুর্গোৎসব ছাড়াও বছরের প্রতিটি দিন মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কোভিড আক্রান্তদের নিয়মিত খোঁজ-খবর নেওয়া, বাড়িতে ফল ও খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া, বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করেছে ক্লাব। কোভিড পরিস্থিতিতে কর্মহীন অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ ও আর্থিক সাহায্যও প্রদান করা হয়েছে। প্রতি বছর নেতাজী জন্মজয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান উৎসব, বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষাসহ ১৩ দিনব্যাপি শিশু, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ আরও বিভিন্ন কর্মকান্ড করে থাকে মডার্ণ ক্লাব। ক্লাব চেষ্টা করে সারা বছর সমাজের প্রতিটি মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকার। আমি ধন্যবাদ জানাই ক্লাবের প্রতিটি সদস্য ও এলাকার প্রত্যেক নাগরিককে যাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় আমরা আমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারছি।

প্রত্যাশা করি সামাজিক কর্মকাণ্ডে সবাই এভাবেই এগিয়ে আসবেন। শারদোৎসব সবার ভালো কাটুক। সবার সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করি।

সঞ্জিত নাহা (লিটন)
সম্পাদক
মডার্ণ ক্লাব

সম্পাদকীয় -

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে...

সবাই কিছু না কিছু ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেয়া হবে। প্রতিদিন খালি গায়ে বড় রাস্তার মোড়ে ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে জুতা সেলাই করেন। দু'টি প্যান্ট ও দু'টি শার্ট নিয়ে হাজির তিনিও। উদ্যোক্তাদের বললেন--- আমারগুলো নেবেন ? এতে বানভাসি দু'একজনের যদি উপকার হয়।

রাত আটটা বাজলেই টিউশন থেকে মেয়ে ঘরে না ফিরলে টেনশনে পায়চারি শুরু করেন মা। কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার পর এই উদ্বেগ আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু, সেদিন রাত ১২ টায় মা মেয়েকে রাজপথে পাঠালেন রাত দখলে।

আসলে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন, সম্মিলিত হন, তখন সব ধর্ম-বর্ণ-ভাষা এক হয়ে যায়। যা আমরা দেখলাম রাজ্যের ভয়াবহ বন্যায় এবং কলকাতার ধর্ষণকাণ্ডের পর। বন্যায় আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সাহায্য নিয়ে ছুটে গেছেন হাজার হাজার মানুষ। অন্যদিকে, আর জি কর কাণ্ডের পর ধর্ষকদের কঠোর শাস্তির দাবিতে আগরতলাসহ সারা দেশে লক্ষ লক্ষ কিশোরী, যুবতীসহ সব বয়সের মহিলারা রাস্তায় নেমে এসেছেন।

আমরা যে সমাজবদ্ধজীব এই ঘটনাগুলো তার উদাহরণ। যেখানেই এই উদাহরণের ব্যাঘাত ঘটে, সেখানেই পরজীবীরা মাথা তোলার চেষ্টা করে। ঘটে সামাজিক বিশৃঙ্খলা। হয় আর জি করের মতো ঘটনা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর রসদ খুঁজে পান না। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি একে অপর থেকে।

একত্রিত থাকা, মানুষের বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তভাবে রুখে দাঁড়ানো, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভূমিকা পালন--- এগুলো নূন্যতম দায়িত্ব। আসলে আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে এই কাজগুলোর সাথে অনেকেরই অনেকটা দূরত্ব বেড়ে গেছে। তাই নূন্যতম দায়িত্বকেও পাহাড় সমান মনে হয়। বোঝা মনে করে অনেকে সরে আসেন। সংখ্যাটা বড় না হলেও এমন মানুষও আছেন, যারা এই দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে পালন করে আসছেন। তাদেরকে আমরা দেখতে পাই, ত্রাণ নিয়ে বন্যাগ্রস্ত রাম-রহিমের দুয়ারে। নারী স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় ভররাতেও রাজপথে।

মানুষে মানুষে মিলন সামাজিক সুরক্ষাকে আরও মজবুত করে তুলে। নূন্যতম দায়িত্বকে তখন আর পাহাড় সমান মনে হয় না। এই মিলনেরই কাজ করে শারদোৎসব। আমাদের বন্ধনকে আরও মজুবত করতে সাহায্য করে। দূর করে মনের মলিনতা। এই পবিত্র মন সারা বছর আমাদের ভালো কাজে উৎসাহিত করুক। শারদোৎসব থেকে এটাই হবে আমাদের বড় প্রাপ্তি।

শারদোৎসবে মডার্ণ ক্লাবের স্মরণিকা 'প্রতিবিম্ব'রও প্রাপ্তি কম নয়। এবারও রাজ্যের এবং বহিঃরাজ্যের বিশিষ্ট লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে ভরে উঠেছে 'প্রতিবিম্ব'র পাতা। এবার ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'প্রতিবিম্ব' সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনের রসে আরও ভরপুর। পাঠকদের মনের খোরাক জোগাতে পারলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের সবার প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শারদোৎসবের শুভেচ্ছা।

পার্থ সারথি দেব
সম্পাদক
'প্রতিবিম্ব'

-: সূচিপত্র :-

প্রচ্ছদ স্টোরি :-

আঙ্কোরভাট : সর্ববৃহৎ মন্দির.. **জবা চৌধুরী** - ৭

প্রবন্ধ :-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত.. **সঞ্জীব দে** - ১
বিদ্রোহী কবি নজরুল.. **ড. গীতা দেবনাথ** - ২
গীতিকার অতুল প্রসাদ সেন.. **মিঠুন রায়** - ১০
কথাসাহিত্যিক সুবিমল রায়.. **সুজয় রায়** - ১২
অন্তর্ভেদী গল্পকার মানস দেববর্মণ **প্রবীর সরকার** - ১৪
কথাকার মানস দেববর্মণ **রঘুনাথ সরকার** - ১৫
এখন চোখ-কান খোলা রাখার লড়াই **ভবানী বিশ্বাস** - ১৬
বই, বইমেলা ও প্রকাশনা শিল্প.. **দেবানন্দ দাম** - ২১
ওস্তাদ শব্দটাই যেন প্রেমময় **নির্মল অধিকারী** - ২৭
দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির... **প্রণয় কুমার রায় বর্মণ** - ২৯
ভারতীয় সংস্কৃতিতে লতা মঙ্গেশকর **অনিন্দিতা দে** - ৩৩
দনুজ দলনী মূর্তিতে নারী সুরক্ষিত হউক.. **সুব্রত সাহা** - ৩৪
Explosion and Its Effects.. **S Roy & J Pal** - ৫৩

কবিতা

দুই রকম **বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী** - ৪
স্বপ্ন **দিলীপ দাস** - ৪
কবি প্রণাম **শেখর সি. দত্ত** - ৪
কবিতার চিত্রকাহিনি **রাতুল দেব বর্মণ** - ৫
বৃষ্টিপাতের পরে... **বীথি চট্টোপাধ্যায়** - ৫
অরূপ-দর্শন **অপাংশু দেবনাথ** - ৫
শ্বাসের বিপরীতে **দিপ্সি** - ৬
শিশু কাল ও সোশ্যাল মিডিয়া **চন্দন কর** - ৬
ধর্ষকেরা যখন রামধনু সাজায়.. **বিষ্ণু শংকর বর্মা** - ১৮
দখলে **মৌসুমী কর** - ১৮
শ্রী-র অঞ্জলি ! **জ্যোতির্ময় রায়** - ১৮
ভুল ঠিকই বুঝতে পারবে **টিংকুরঞ্জন দাস** - ১৯
জন্মভূমি **ডা: সুবল চন্দ্র দেব** - ১৯
আলো **ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী** - ১৯
ভুলে যেও মা ! **সুস্মিতা দেবনাথ** - ২০
অবিন্যস্ত জীবনে **নিয়তি দাস** - ২০
সুর ছুঁয়ে **ভবানী বিশ্বাস** - ৩৬
দুর্গাপূজা **রাখী দেব** - ৩৬
বাহ ইন্টার্ণ বাহ **শ্যামল কান্তি দে** - ৩৬
কালো অধ্যায় **সংহিতা ভট্টাচার্য** - ৩৭
বিজ্ঞাপন প্রলোভন **দীপক রঞ্জন কর** - ৩৭
দুরন্ত দুর্দম **শিমূল কুমার রায়** - ৩৮
পূর্ব বিসর্জন **অরুণিমা ঘোষ** - ৩৯
মায়ের আগমনী **মনচলি চক্রবর্তী** - ৩৯
আড্ডা **শুভঙ্কর চক্রবর্তী** - ৪০

খেলা :-

প্যারিসে লুক্সেমবার্গের হৃদয়ে ইন্ডিয়া **সরযূ চক্রবর্তী** - ৫৫
প্যারিস প্যারা অলিম্পিক.. **বিপ্লব কুমার চন্দ** - ৫৬
ত্রিপুরার হকি **লক্ষ্মণ দেব** - ৫৭

গল্প :-

'বু' **অগ্রতা দেব** - ২৪
টুকাই **চন্দন আচার্য** - ৩১
চোখের আলোয় **ধূর্জটী কুমার সাহা** - ৪১
সবার উপরে **জহর দেবনাথ** - ৪৫

স্মৃতিকথা :-

একটি নাটক ও চন্দনদা **কার্তিক বণিক** - ২৩
সন্তান হারা বাবা-মা'র ..... **মঞ্জুরী ভট্টাচার্য (কর)** - ২৬

বিজ্ঞান :-

শব্দ দূষণ ও পরিবেশ **পূর্ণোপমা রায় বর্মণ** - ৪৭
মঙ্গল গ্রহকে বাসযোগ্য করার সম্ভাবনা - ৪৮
রাগ বশে নেই ? - ৪৯
হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারে থ্রিডি প্রিন্টেড রক্তনালী - ৫০

চালচলন :-

বয়স ত্রিশ পার হওয়ার আগেই হৃদরোগ ? - ৫০
মকরাসন - ৫১
সিম সোয়্যাপ স্ক্যাম, নিমেষে ফাঁকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট - ৫২

দ্বিশত জন্মবর্ষ

কালজয়ী আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সঞ্জীব দে

১৮২৪ থেকে ১৮৭৩ সাল, ৪৯ বছরের আয়ুষ্কাল। যশোরের (বাংলা) দুরন্ত বালক বাংলা কবিতার প্রথম বিদ্রোহী কবি তথা আধুনিক বাংলায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচয়িতা, প্রথম মহাকাব্য, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের অগ্রদূত ও প্রহসন প্রবর্তক যিনি, তিনি আর কেউ নন, রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি চার সন্তানের গর্বিত পিতা ও রেবেকা থম্পসনের গর্বিত স্বামী। যার ধর্ম খ্রিস্ট হলেও তিনি মনে প্রাণে ছিলেন সনাতনী ও বাঙালি। যদিও ১৭ বছর বয়স থেকে ইংরেজি কবিতা দিয়েই লেখা শুরু। তিনি শুরু থেকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত ধারাকে চিন্তা চেতনার মাধ্যমে আঘাত করে সংশোধন করতে চেয়েছেন মনে প্রাণে। আজীবন তার লেখায় আমরা পেয়েছি প্রচলিত ভাবধারার ত্রুটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে।

তিনি সাহিত্যের প্রবহমান ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মনের ভাবনাকে ছন্দবদ্ধ করেন। তাই তিনি সাহিত্যের বাঁক বদলে কবিতার ভুবনে প্রথম ও কালজয়ী আধুনিক কবি।

কালজয়ী বলছি এই কারণেই, তার লেখায় বারবার ফুটে ওঠেছে, মানবতাবাদী চেতনা ও কল্যাণবোধ। তিনি সেকালের সমাজ ব্যবস্থার গোড়ায় আঘাত করতে পেরেছেন। সে সময়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় তিনি আতিশয্য, গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা, ভণ্ডামি, বাবু সমাজের নানা চরিত্রের মূলে প্রশ্ন এঁকে দিয়েছিলেন। তার প্রহসনগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব তিনি সমাজের সমস্ত কুউন্মোচনের কাজ করেছেন।

আজ ২০০ বছর পরেও মাইকেলের উচ্চারণ সমান প্রাসঙ্গিক। সমান আধুনিক। যাকে অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র উপায় নাই।

সাহিত্যে নতুন চিন্তা ও আধুনিক ভাবনা মিশ্রিত মাইকেল আঠারো শতকে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার অঙ্কুর বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছেন প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের যৌথ ভাবনায়।

তার যে সব লেখায় আধুনিকতা ও বিদ্রোহের প্রকাশ ঘঠেছে উন্নত চেতনায় — সেই কাব্যগুলো হলো— তিলোত্তমা সম্ভব -১৮৬০/ ব্রজাঙ্গনা কাব্য - ১৮৬১/ মেঘনাদবধ - ১৮৬১ / বীরাঙ্গনা — ১৮৬২/ চতুর্দশপদী কবিতাবলি - ১৮৬৫/ প্রভৃতি। তার এই কাব্যগুলোতে মানবতাবাদের বাস্তব প্রয়াস দারুণভাবে উপলব্ধি করা যায়। 'বীরাঙ্গনা' তে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছান্দিক অভিব্যক্তি দারুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অনেক নারীকে কুসংস্কার ও গোড়ামি মুক্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। ' ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে কষ্ট যন্ত্রণা, কাব্য চেতনা দারুণ স্ফুরণ ঘটেছে। আবার 'তিলোত্তমা সম্ভব' এ স্বাধীকার আন্দোলনসহ চেতনাবোধ উপলব্ধি করা যায়।

বিভিন্নরকম সামাজিক স্থবিরতা ও অনুন্নয়ন মধুসূদন দত্তকে দারুণভাবে আঘাত করে। যা তার বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ পায়। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বদেশ প্রেম, নারী স্বাধীনতা, মানবিক বোধ, স্বাধীন চিন্তা, নারী অধিকার ও শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন।

মাইকেলের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো— তিনি হিন্দু সমাজের বর্ণবাদী, ধর্মবাদী বিশ্বাসের উপর প্রবলভাবে আঘাত এনেছিলেন। তার বিদ্রোহ ছিল সব সময় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও প্রচলিত বিশ্বাসের উপর। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সবসময় তার কলম জাগরুক ছিল। তাই যারা হাতে বৈষ্ণবের মালা, মুখে কৃষ্ণের নাম, কিন্তু স্বভাবে জাতি বিচারশূন্য লম্ফট তিনি তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। একটা জাতি যখন তমসাচ্ছন্ন, দুর্বল, দরিদ্র, পরাধীন জাতীয়তাবোধহীন, ভীরু, অলস, ধর্মভীরু এমন পরিস্থিতিতে তাদের মনের সঠিক জায়গায় আঘাত করে নতুনভাবে চিন্তা করার দ্বার খুলে দিয়েছেন লেখনীর মাধ্যমে।

এটা ঠিক কোনও বিশুদ্ধ প্রতিভাই স্রোতের অনুকূলে চলা পছন্দ করে না। মাইকেলের প্রতিভা সেই প্রতিভা যা স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে অন্তরাত্মার ছন্দিত অভিব্যক্তির শৈল্পিক প্রকাশ ঘটাতে পারে। মাইকেলের পাচ্য ও পাশচাত্যের শিক্ষা গতানুগতিক ভাবধারাতে গা ভাসানোর শিক্ষা নয় বরং প্রচলিত ভাবধারাকে অতিক্রম করে সমস্ত তামসিক ভাবধারাকে আঘাত করে নতুন এক ভাবধারাতে উত্তরণ করে সমাজকে নতুন দিশায় পথ চলতে অনুপ্রাণিত করা। তাঁর শানিত উচ্চারণ তাই প্রমাণ করে। আজ ২০০ বছর পরেও মাইকেলের উচ্চারণ সমান প্রাসঙ্গিক। সমান আধুনিক। যাকে অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র উপায় নাই। মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণকে যে আসনে বসিয়েছেন তার দর্শন ও ব্যতিক্রমী চিন্তা তারই সাক্ষ্য বহন করে। তিনি অন্ধকারকে কষাঘাত করে বার বার কুসংস্কার, জড়তা ও সত্যের দ্বারোদঘাটন করতে চেয়েছেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁস — শিল্প বিপ্লব ও বাংলার নবজাগরণের সমন্বয় তাকে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করেছে। শেক্সপিয়ার, পেত্রাক ও মিলটনের চিন্তার প্রভাব ও সমন্বয় তার মধ্যে আধুনিক চিন্তার গতি সঞ্চারিত হয়েছে — এই কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। প্রাচ্য ও পাশচাত্যের সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষা তার জীবনের এক দারুণ অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন। তার মধ্যে গতানুগতিক চিন্তা ভারনার বাইরে গিয়ে নতুন দর্শনবোধন তার লেখায় উদ্ভাসিত হয়েছে। যা বাংলা সাহিত্যের নতুন গতিপথ বদলে দিতে সাহায্য করেছে।

বিদ্রোহী কবি নজরুল

ড: গীতা দেবনাথ

বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট নাম কাজী নজরুল ইসলাম। ঘটনাবহুল ও বর্ণময় তাঁর জীবন। তিনি বিদ্রোহী কবি, একই সঙ্গে মানব প্রেমিক। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা তাঁর সমগ্র সৃষ্টির উৎস। নজরুল ছিলেন আপসহীন কবি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। তিনি জনগণের কবি।

নজরুলের জীবন ছকে বাঁধা ছিল না। তিনি অল্প বয়সেই লেটো-গানের দলে যোগ দেন। মাত্র ন বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। চৌদ্দ বছর বয়সে শিয়ারশোল স্কুলে ভর্তি হন। গান গাওয়া, বাঁশি বা ঢোলক বাজানো তিনি কারুর কাছে শেখেননি। এগুলো ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভা। স্কুল জীবনে রানিগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্র শৈলজানন্দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাধর সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : আমার সৌভাগ্য, আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম এমন একটি মানুষকে ঠিক যে সকল মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র। অজস্র প্রাণপ্রাচুর্য, অবিশ্বাস্য রকমের হৃদয়ের উদারতা, বিদ্বেষকালিমামুক্ত অপাপবিদ্ধ একটি পবিত্র মন। তার নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মতো একটি আপনভোলা প্রকৃতি।

> *"...কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।"*

এরপর ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ নজরুলের জীবনে আরেকটি বিশেষ পর্ব। এই সময়ে তিনি করাচিতে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। করাচির সেনা ছাউনিতে নজরুলের জীবন অভিজ্ঞতা আরেকটু দৃঢ় হয়েছিল। করাচিতে থাকাকালীনই তিনি গল্প কবিতা রচনা করে 'সওগাত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও 'নূর' -- এই তিনটি পত্রিকায় পাঠাতেন।

১৯২১ এর ডিসেম্বর মাসে তিনি লিখলেন বিদ্রোহী কবিতা। এই বিদ্রোহী কবিতা পরাধীন ভারতবর্ষে সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। অগ্নিবীণার কবি নজরুল রচিত কবিতা ছিল তৎকালীন সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা উৎসব। বিদ্রোহীর নজরুল, অগ্নিবীণার নজরুল, ধূমকেতুর নজরুল ব্রিটিশ শাসকের রোষে কারাদন্ডিত হলেন। কারামুক্তির পর তিনি তার সৃষ্টিতে আরো আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কলিকাতা এলবার্ট হলে কবি নজরুল ইসলামকে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল। সে সভায় বহু সাহিত্যিক কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। নজরুল সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এস ওয়াজেদ আলী। তিনি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। সেই সভায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুও উপস্থিত ছিলেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর ভাষণে বলেন, নজরুল কবি - প্রতিভাবান মৌলিক কবি। তিনি বাংলার কবি, তিনি বাঙালির কবি। কারাগারের শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন তা বাঙালির প্রাণে এক নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে এস ওয়াজেদ আলী যে অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন তাতে বলা হয়েছে : "তোমার কবিতা বিচার-বিস্ময়ের উর্ধ্বে - সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগলাঝোরার জলধারার মত। এই সভায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে বলেছেন : স্বাধীন দেশে জীবনের সহিত সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই। দেশ পরাধীন বলে এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানাদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব - কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন : কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম - অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশি। এতেই

বোঝা যায় যে নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ। কারাগারে আমরা অনেকে যাই কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এতেও বোঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ। তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না। নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় - এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব - তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম-গিরি-কান্তার মরু'র মত প্রাণ-মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।”

এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নজরুলের প্রতিভাষণ। এই প্রতিভাষণে নজরুল বলেছেন -

“বন্ধুগণ ! আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে দিলেন, আমি তা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনুমন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটি মাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যে দিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো-লেগেছে' -টাকে ভালো করে বলতে পারার এই উৎসবে আমার আজকে একটি মাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা।

আমাকে 'বিদ্রোহী' বলে খামখা লোকের মনে ভয় ধরে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আচঁড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনোদিন নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে! আমি তাতে একআধটুকু সাহায্য করেছি মাত্র।

একথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজও উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীটসের মতো আমারও মন্ত্র Beauty is Truth– Truth is Beauty। আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে - কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজও দিতে পারিনি, আমার দেবার ক্ষুধা আজও মেটেনি। যে উচ্চ গিরিশিখরের পলাতক সাগরসন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি, যেন মরুপথে পথ না হারাই! - এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান- সেনাদলের তূর্য্য-বাদকের একজন আমি- এই হোক আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিলফণা ভুজঙ্গ, প্রখরদর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি এবং তাদের নখর-দংশনের ক্ষত আজও আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধাদীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।”

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ১৯৪২ সালের পর থেকেই শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন নির্বাক।

১৯৬০ সালে ভারত সরকার কবি নজরুল ইসলামকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। দুর্ভাগ্যবশত এই সম্মান উপভোগের সামর্থ্য বা বোধশক্তি সেদিন নজরুলের ছিল না। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭২ সালে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ সরকার কবিকে সপরিবারে সেদেশে নিয়ে যান। ১৯৭২ সালের ২৪ মে বাংলাদেশ বিমানে কবিকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন হয়। ধানমন্ডি সরকারি বাসভবন থেকে তাঁকে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সরকারি হাসপাতালের সেই কেবিনেই ১৯৭৬ - এর ২৯ আগস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কবি অন্নদাশংকর রায় সেদিনই লিখেছিলেন 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' এই কবিতাটি। কবিতাটির শেষ স্তবক :

কেউ জানলো না ইতিহাসে ফের
ভুল হয়ে গেল বিলকুল
এতকাল পরে ধর্মের নামে
ভাগ হয়ে গেল নজরুল।

দুই রকম

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

আমার ছিল দাদু দিদা পিসি কাকা কাকি
স্কুলের পথে এঘর ওঘর সবার ডাকাডাকি
আর ছিল এক মস্ত পুকুর মাঠ নদী বন পাহাড়
চাটাই পেতে নেমন্তন্ন কলা পাতায় আহার।
বেলা শেষে খেলাই ছিল মাঠ কাঁপানো বিকেল
আম কাঁঠালে বাগান ভরা ডালিম আতা বেল।
ঘরের পাশে ফুলের মেলা মৌচাকে মৌমাছি
বলতো সবাই মিলেমিশে আনন্দে তাই আছি।

দশতলাতে কল্পতরুর ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট
মাঠ বলতে ঘরের মেঝে ক্রিকেট বল ও ব্যাট।
স্কুলের বাসে আসা যাওয়া এবং স্যুট ও বুট
টিউশনিতে বিকেল বাঁধা জেরক্স কিংবা নোট।
অনলাইনে খাবার দাবার মাংস পোলাও রুটি
রোববারেও টিচার আছেন নেই বুঝি তাই ছুটি।
সবার আশা ভালোবাসা রেজাল্ট এ টু জেড
সব বিষয়েই পেতে হবে একশ'তে হানরেড।

বলবে জানি ছুটির আকাশ দেখতে নিয়ে চলো
ছন্দহারা বন্ধ জীবন ভাল্লাগে কার বলো?

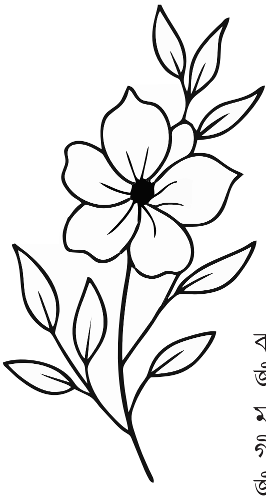

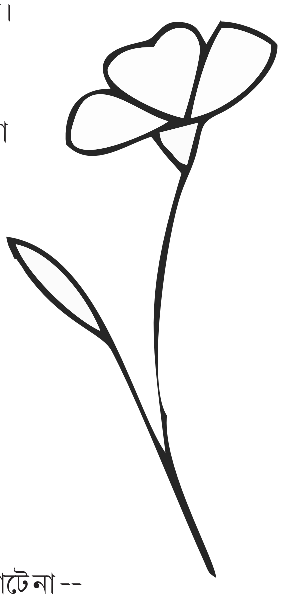

স্বপ্ন

দিলীপ দাস

মধ্য রাতে নিজেকে বলি, ঘুমুও বৎস,
নির্ঘুম রাতে স্বপ্ন আসে না,
পারিজাত যেমন স্বর্গ ছাড়া আর কোথাও ফোটে না --

ঘুমুও। গভীর ঘুমে স্বপ্ন কড়া নাড়ে না
বন্ধ ঘরে স্বপ্ন আসে না
স্বপ্নের জন্য দরজা খুলে রেখো।

স্বপ্ন নীরবে আসে,
নীরবেই চলে যায়।
চোখ বুজে থাকো,
তাকে খালি হাতে চলে যেতে দিও না ---

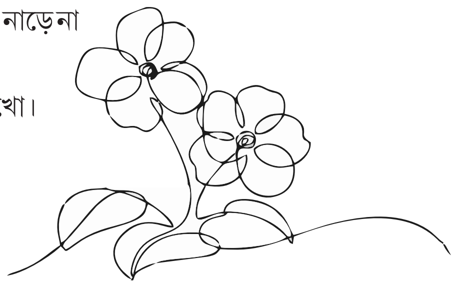

কবি প্রণাম

শেখর সি. দত্ত

বয়সটা ঘড়ির কাঁটা
জীবনটা জোয়ার ভাটা
মননে বোধে ধোঁয়াশা কুয়াশার আস্তরণ,
গীতাঞ্জলি ছুঁয়ে
জীবনের গদ্য পদ্যে উত্তরণ।
আজকের জটিল ভাষা মরু প্রান্তরে

কবি, তুমিই অবিরাম কাব্য,
আমাদের অস্তিত্বের মনন ও চেতনে।

তুমি কবি রবি
নানা রঙে কথা বলে
তোমার আঁকা ছবি।
গানে প্রথম তুমিই দিলে সঞ্চারী
নানা রাগে -
ভাষা ছন্দে নানা ফুলে
সাহিত্যে সাজালে ভরা বসন্ত
তোমাতে অনন্ত জাগে
তুমার রক্তকরবী রাজর্ষি ছুঁয়ে
ধন্য ত্রিপুরার ধর্ম সংস্কৃতি,
আজও শুনি -
'এতো রক্ত কেনো'
এক বিশ্বজনীন কালোত্তীর্ণ আকুতি।

অনিমেষ শব্দবন্ধ মুহূর্তে
অনাহুত চরিত্রের ঝলকানিতে

যখন আড়ষ্ট হয় কবিতা
কবন্ধ উনার মতো
তোমার স্পর্শে ফোটে
নৈসর্গিক চিত্রলেখা।
হৃদয় যখন ভিতরের সাথে
বাইরের আড়াল খোঁজে
দীর্ঘসূত্রতায় বহুমাত্রিক ব্যাপ্তিতে
তোমার কবিতা সাজে।

তুমি স্বজনের মুখ
আমাদের আত্মার চির সুখ।
তাই একান্ত সউৎসারিত অনুভবে
এক সমুদ্রবুক ভালোবাসা
কবি, আজ তোমায় দিলাম
দিনের অগ্রভাগে, ইমন রাগে।

কবিতার চিত্রকাহিনি

রাতুল দেব বর্মণ

কবিতা এখন খুব কুসুম কুসুম
তুলতুল ধবলিমা ভেঙে পড়ে কোলে
গরিমায় ঝুলে যেতে যেতে
মাথা নুয়ে শুয়ে থাকে
-বুকের ভেতর
যেন ওমহীন দুটি ডানা
যাপনের দিন ভাসে
জলে কহ্লার।

নিয়েছো যুবতী ফুল
প্রতি প্রহরে খুব ভালবাসে,

বাউলা বাতাস ফুরিয়ে গেলে
কবিতা কল্পনালতা বুকে শুধু চিত্রকাহিনি
তবু কবিতা জেগে থাকে
চিরন্তন ক্ষুধা মাতমের ভিতর।

বৃষ্টিপাতের পরে যেটা ভীষণ মনে পড়ে...

বীথি চট্টোপাধ্যায়

কোনও দোকানে পাওয়া যাবেনা বৃষ্টি আর মেঘ,
শপিং মলে সাজানো নেই হাওয়ার গতিবেগ।
বৃষ্টি যদি না আসে তবে কোথায় যাবে লোকে
পয়সা দিয়ে কেনা যাবেনা আকাশ থেকে ওকে।

প্রতিটি দিন সূর্যালোক পেয়েছি এমনিতে
চাঁদের আলো হঠাৎ এসে বলেনি দাম দিতে।
পয়সা দিয়ে পাইনি কেউ ঝড়ের যাওয়া আসা
যেমন ভাবে কেনা যায়না মায়ের ভালোবাসা।

ছুটি নেয়না জোয়ার ভাটা সমুদ্রের ঢেউ
সূর্য্য ওঠে এমনিতেই ভেবে দেখেছি কেউ?
বৃষ্টি ঝেঁপে আসার পরে দিতে হয়নি দাম
মানেটা যদি না-বুঝি তবে ভালোনা পরিণাম।

অরূপ-দর্শন

অপাংশু দেবনাথ

একদিন অরূপের কাছে যেতে চেয়েছিলো
হৃদয়ে নিষ্ঠুর হয়ে সেই পথে সঁপি স্বজনদের আমরা।

আমাদের চারপাশে একেকটা অপূর্ব পাপড়ি খুলে পড়ছে সহসা,
অসহায়ের মতো অশ্রুর পরিমাপ জানিনা বলেই,
দিঘিসংলগ্ন প্রপিতামহ বয়সী বৃক্ষচোখে তাকিয়ে থাকি শূন্য পথে।

তুমিই সাক্ষাৎ করিয়েছো তার সাথে কোনো অপরাহ্ণে,
সেই থেকে এই ফাঁড়িপথে গেলেই বৃক্ষটির ছায়ায় একটু দাঁড়াই,
অসংখ্য খণ্ডচিত্র ভাস্কর্য রূপে ঘিরে ধরে।

মনে হয় শরীরের সকল সুগন্ধ ঝরে পড়ে মায়াবী মাটিতে,
আমরা তখন বৃন্তে লটকে থাকা জোনাকিমাত্র।

একদিন নিজস্ব বাড়িটি সকলকেই চিনে নিতে হয়,
অথচ সাজানো ঘরটির পলেস্তারা ছুঁয়ে আছে সুখ,
সব সুখ মানুষের নয়।

অতপর এই পথ অরূপের দিকেই গিয়েছে অন্ধকারের দুয়ার ঠেলে!
বৃহতের সাথে মিশে গেলে শূন্যে পড়ে থাকে
সময়ের কুড়োনো তামা পিতল সিসা।
জানালা দরোজা জুড়ে ঝুলে থাকে মৃত মাকড়শা,
আড়শোলা কিংবা প্রত্নপ্রজাপতির রঙিন পাখা।

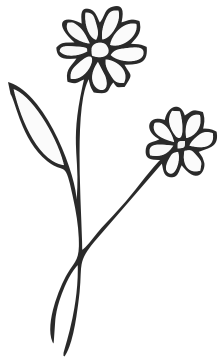

শ্বাসের বিপরীতে

দিপ্সি

শ্বাসের শব্দ ধীর হয়ে আসে নাভিতে
জমে ছায়া তাড়িত একটি রাত।

রাত ধীরে ধীরে ছোট হতে শুরু
করলে হতাশা জন্মায় বেলকনিতে,

সুরের সাধনা শেষে গলে যায় পাহাড়
এরপর মুখোমুখি হিসেব করে যায়,

রাত্রি কতটা গাঢ় হলে
হৃদয়ে সুরের ছন্দ এক হয়ে যাবে।

এরপর আমরা খুঁজতে শুরু করি
শব্দ, অন্তরিন সুরের আসর জমে উঠলে,

শিল্পী গিলে খায় হৃদয়ের শব্দ। অতপর,

দুটি শরীরের সাধনারত কালে সুর
আর কবিতার স্নান যাত্রা দেখি নীরবে।

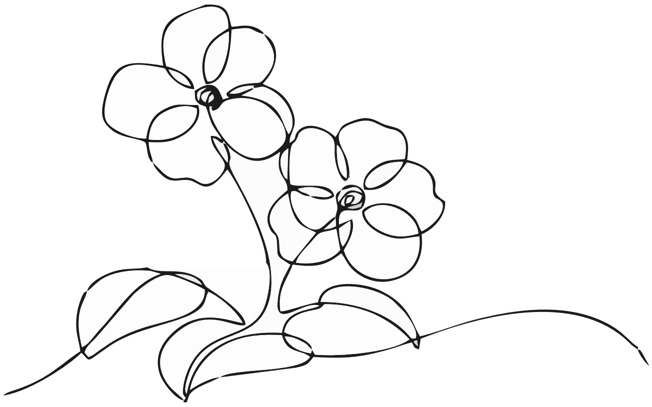

শিশু কাল ও সোশ্যাল মিডিয়া

চন্দন কর

শিশুদের হাসি শিশুদের খেলা আর ছোট্ট ছোট্ট স্বপ্ন,
শিশুদের চোখে জগতের নানা রঙের ছবির রত্ন,
কিন্তু এই ডিজিটাল জগতের এক নতুন আসর,
সোশ্যাল মিডিয়া, যে এসেছে সবার নিকট আশর।
অজানাকে জানার, শেখার অবারিত দরজা,
ভিডিও, ছবি, গানের ভরা এক কল্পনার বার্তা,
কিন্তু সেই দরজার অন্যপাশে লুকিয়ে আছে বিপদ,
অতিরিক্ত সময়, গোপনীয়তা, সবই হয়ে ওঠে বিভ্রান্তের পথ।
শিশুদের সৃজনশীলতার উৎস, নতুন ভাবনা জাগায়,
কিন্তু মিথ্যা তথ্য, নেতিবাচকতা শিশু মনকে দাগায়।
মাথার ভিতর গড়ে ওঠে নানা অস্পষ্ট চিন্তা,
সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে বেড়ে ওঠে দুষ্ট চিন্তা।
নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারির অতি প্রয়োজন হয়,
শিশুদের বুঝাতে, কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে তারা।
আলাপচারিতায় গঠন মূলকে গড়ে উঠুক সচেতনতার বাতিঘর,
যেখানে ভালোবাসা ও দায়িত্বের কাধে কাধ ও থাকুক সম্পর্কের মধুর সুর ঘর।
শিশুদের হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে,
সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে, কিন্তু দূরে থাকতে হবে।
একই সাথে খেলাধুলা, গল্প, সামাজিকতা আর বইয়ের মাঝে,
অথবা প্রকৃতির কোলে, সারি সারি বন্ধুত্বের মন মাঝে।

শিশু কাল, সোশ্যাল মিডিয়াএখনো আলোচনার বিষয়,
সঠিক নির্দেশনা, সচেতনতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হয়।
একসাথে যদি এগিয়ে চলি, চিন্তা করি গভীর,
তাহলে শিশুদের ভবিষ্যৎ হবে সবার জন্য উজ্জ্বল ও মধুর।

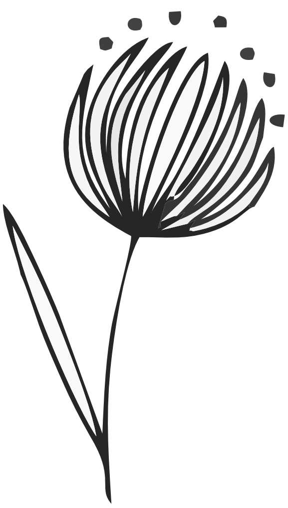

প্রচ্ছদ স্টোরি

আঙ্কোরভাট : পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মন্দির

জবা চৌধুরী ◆ আটলান্টা

আঙ্কোরভাট মন্দিরে বরের সাথে লেখিকা

শীতকাল এলেই একটা ছুটির হাওয়া মনকে ছুঁয়ে যায়। আসলে এই অভ্যেসটা বেশ অনেক বছরের। গরমে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি আমরা অনেকবার। যদিও বাচ্চারা তখন অনেকটাই ছোট। কিন্তু সেই থেকে শুধুমাত্র শীতের দেশগুলোকে গরমের ছুটির ভরসায় রেখে বাকিটুকু আমরা তুলে রেখেছি শীতের ছুটির জন্য।

২০২৩ সালের শেষ। শীত চলছে। বেড়াতে যাবার প্ল্যান ফাইন্যাল হতেই একটা চাপা উত্তেজনা চলতে লাগলো আমাদের বাড়িতে। এমন দু'টো দেশে আমাদের বেড়াতে যাওয়া ঠিক হয়েছে--- যে দেশগুলো দেখার অপেক্ষায় ছিলাম অনেক অনেকদিন ধরে। এর প্রথমটি হলো ভিয়েতনাম এবং দ্বিতীয়টি কম্বোডিয়া। ডিসেম্বরে প্রথম আটদিন ভিয়েতনামে কাটিয়ে সেখান থেকে বছরের শেষ দিনটিতে আমরা আকাশপথে রওয়ানা দিলাম কম্বোডিয়ার দিকে। সিয়েম রিপ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছোলাম তখন দিনের আলোকে সন্ধ্যা বিদায় জানাতে ব্যস্ত।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখলাম একটি গাড়িতে আমার হাজব্যান্ডের নাম লেখা রয়েছে। বুঝলাম সেটি-ই আমাদের রিজার্ভ করা গাড়ি। স্বপন হাত দেখাতেই ড্রাইভার নেমে এলো। এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় দু' ঘন্টা দূরে একটি এপার্টমেন্টে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো চারদিনের জন্য। সে রাতে ওখানে আমরা নিজেরাই রান্না করে খাবো সেভাবেই প্ল্যানও ছিল। তাই রাস্তার পাশের দোকানপাট নিয়ে বসা বাজার দেখে আমরা নেমে সবরকম গ্রোসারি কিনে নিলাম। আগে থেকেই জানা ছিলো আমরা যেখানে থাকবো সেটি শহরের বাইরে এবং পছন্দমতো রেস্টুরেন্ট পাবার আশা খুবই কম। তাই আমরা সে রাতের জন্য কোনো ঝুঁকি নিলাম না। আমাদের যেহেতু আঙ্কোরভাট দেখাটাই প্রধান উদ্দেশ্য তাই, সেই শহরের আশেপাশেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল আমাদের। ওখান থেকে গাড়িতে মাত্র কুড়ি মিনিট দূরে আঙ্কোরভাট--- কম্বোডিয়ার গৌরবময় ইতিহাসের শহর।

...আমাদের দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে কম্বোডিয়ায় রয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের স্থাপিত পৃথিবীর সবচে' বড় মন্দির। শুধু আকারে বড় নয়, এই মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী ও কারুকার্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

মন্দির নিয়ে কথা বলতে সাধারণত আমাদের নিজেদের দেশ ভারতবর্ষের কথাই সবচে' প্রথম মনে করি। কিন্তু আমাদের দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে কম্বোডিয়ায় রয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের স্থাপিত পৃথিবীর সবচে' বড় মন্দির। শুধু আকারে বড় নয়, এই মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী ও কারুকার্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়। আঙ্কোরভাট কথাটির অর্থ মন্দিরের শহর। এই শহর নিয়ে কথা শুরু করার আগে এর

ইতিহাসটুকু জেনে নেওয়াটা দরকার।

আঙ্কোরভাট বা মন্দিরের এই শহরে বিষ্ণু মন্দির ছাড়াও শতাধিক মন্দির ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে সব মন্দিরকে ছাপিয়ে রয়েছে আঙ্কোরভাট মন্দিরটি, এক অনন্য উচ্চতায়।

দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। সেই সময়ে আঙ্কোরের শাসক ছিলেন দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ। তিনি নিজের রাজধানী এবং প্রধান উপাসনালয় হিসেবে এই বিশাল স্থাপত্যটি নির্মাণ করেছিলেন (১১১৩ - ১১৫০ সাল)। রাজা সূর্যবর্মণের মৃত্যুর পর মন্দিরের নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। তাই মন্দিরের দেয়ালে কিছু কারুকাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। তখন দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে এক শক্তিশালী সরকার গঠন করেছিলেন, সেটা তাঁর এই স্থাপত্য দেখলেই অনুমান করা যায়। তাঁদের সাম্রাজ্যকে বলা হত খেমের সাম্রাজ্য। খেমের সাম্রাজ্যের আরাধ্য দেব মহাদেব হলেও দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বিষ্ণুদেবের জন্য। মূলতঃ এটি খেমের সাম্রাজ্যের রাজার বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা একটি হিন্দু মন্দির। পরে অবশ্য এটি ধীরে ধীরে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই কারণে এটিকে 'হিন্দু-বৌদ্ধ' মন্দির হিসেবেও বর্ণনা করা হয়।

আঙ্কোরভাটে সপরিবারে লেখিকা

অঙ্কোরভাটের নির্মাণশৈলী খেমের স্থাপত্যশৈলীকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই মন্দিরের নির্মাণকৌশলে দুটো পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে---টেম্পল মাউন্টেন ধাঁচ (পাহাড়ি মন্দির ধাঁচ) এবং গ্যালারি মন্দির ধাঁচ।

হিন্দু পুরাণের বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর কেন্দ্র সুমেরু পর্বতে দেব-দেবীদের বসবাস, তাই সেই সুমেরু পর্বতের আদলেই এই মন্দিরের মূল অংশ নির্মাণ করা হয়।

মন্দিরের পাঁচটি চূড়া সুমেরু পর্বতের পাঁচটি পর্বতশৃঙ্গকে নির্দেশ করে। এই মন্দিরের সুরক্ষার জন্য মন্দিরের চারদিকে রয়েছে বিশাল পরিখা (trench)। ধারণা করা হয় সেই পরিখাগুলো কয়েকশ' ফুট গভীর। এছাড়া রয়েছে সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর। সম্পূর্ণ স্থাপনাটি প্রায় পাঁচশ একর এলাকা জুড়ে বিস্তারিত।

বাইরের দেয়ালটি দৈর্ঘ্যে ১০২৫ মিটার, প্রস্থে ৮০২ মিটার এবং উচ্চতায় ৪.৫ মিটার। এর চারদিকে ৩০ মিটার দূরত্বে ১৯০ মিটার চওড়া একটি পরিখা আছে। মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য পূর্ব দিকে একটি মাটির পাড় এবং পশ্চিম দিকে একটি বেলেপাথরের জলাশয় রয়েছে। এই জলাশয়টি মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার এবং মন্দির নির্মাণের অনেক পরে যোগ করা হয়েছে।

মূল মন্দিরটি শহরের অন্যান্য স্থাপনা হতে উঁচুতে অবস্থিত। এতে রয়েছে তিনটি পর্যায়ক্রমে উচ্চতর চতুষ্কোণ গ্যালারি, যা শেষ হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় টাওয়ারে। এই গ্যালারিগুলো যথাক্রমে রাজা, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। প্রতিটি গ্যালারির মূল (কার্ডিনাল) বিন্দুগুলোতে একটি করে গোপুরা রয়েছে। ভিতরের দিকের গ্যালারিগুলোর কোণায় রয়েছে টাওয়ার। কেন্দ্রের টাওয়ার এবং চার কোণের চারটি টাওয়ার মিলে পঞ্চবিন্দু নকশা সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের মৃত্যুর পর মন্দিরটি সূর্যবর্মণের সমাধিসৌধ হিসেবেও বিবেচিত হত। আসলে তখনকার সত্যিকার ইতিহাসের কোন সাক্ষ্য এমনকি মন্দিরের পূর্বনাম সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায় না।

১১৭৭ এর দিকে খামেদের চিরশত্রু চামদের দ্বারা এই মন্দির লুণ্ঠিত হয়। ধারণা করা হয় তখন এই মন্দিরের চূড়াগুলো স্বর্ণ দিয়ে মোড়ানো ছিল। পরবর্তীতে ৭ম জয়বর্মন রাজ্যটিকে পুনর্গঠন করেন ও নতুন রাজধানী করেন অঙ্কোরথমকে এবং বায়ু নগরে প্রধান মন্দির স্থাপন করেন।

তবে কম্বোডিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের সাথে সাথে ১৪শ থেকে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে এই হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এখান থেকে বিষ্ণু মন্দির কখনও স্থানান্তরিত হয়নি। এমনকি এই মন্দিরে এখনো প্রধান দেবতা হিসেবে ভগবান বিষ্ণুর পূজা হয়। ষোড়শ শতকের পর থেকে এই মন্দির অবহেলিত হতে শুরু হয়, কিন্তু কখনওই পরিত্যক্ত হয়নি। মন্দিরের চারপাশের বিশাল পরিখার জন্যই এই মন্দিরকে জঙ্গলের গাছপালা গ্রাস করতে পারেনি।

পশ্চিমী পরিব্রাজকদের মধ্যে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক আন্তোনিও দা মাগদালেনার প্রথম এই মন্দির ভ্রমণ করেন ১৫৮৬ সালের দিকে। এই মন্দির ভ্রমণ করে তিনি লিখেছিলেন---

'এটি (মন্দিরটি) এমন অসাধারণ ভাবে নির্মিত যে, ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। সারা বিশ্বে এরকম আর কোন

ভবন বা স্থাপনার অস্তিত্ব নাই। এখানে রয়েছে খিলান ও অন্যান্য কারুকার্য, মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য সেরা সৃষ্টি।'

পাশ্চাত্যে এই মন্দিরের কথা ছড়িয়ে পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি অভিযাত্রী অনরি মৌহত এর ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে। তিনি লিখেছিলেন---

'এই মন্দিরগুলির মধ্যে এটি (আঙ্করভাট), সলোমনের মন্দিরকেও হার মানায়। মাইকেলেঞ্জেলোর মতোই কোন প্রাচীন শিল্পী এটি নির্মাণ করেছেন। আমাদের সবচেয়ে সুন্দর ভবনসমূহের সাথে এটি সমতূল্য। এটি এমনকি প্রাচীন গ্রিস বা প্রাচীন রোমের স্থাপনাগুলির চাইতেও অনেক বেশি রাজকীয়, সুন্দর। বর্তমানে এই দেশটি (কম্বোডিয়া এলাকা) যে বর্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে, তার সাথে এই মন্দিরের বিশালতার ও সৌন্দর্যের এক বিশাল ফারাক রয়েছে।'

বিংশ শতাব্দীতে আঙ্করভাটের ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন হয়। এ সময় প্রধানত এর চারিদিকে গ্রাস করে নেয়া মাটি ও জঙ্গল সাফ করা হয়। গৃহযুদ্ধ ও খ্মের রুজ শাসনকালে ১৯৭০ ও ১৯৮০ এর দশকগুলিতে সংস্কার কার্য বাধাগ্রস্ত হয়। তবে আঙ্করভাট এলাকায় পরে স্থাপিত মূর্তিগুলি চুরি যাওয়া ও ধবংস করে ফেলা ছাড়া মূল মন্দিরের খুব একটা ক্ষতি এসময় হয় নাই।

বর্তমানে আঙ্করভাটের মন্দিরটি কম্বোডিয়ার জাতীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এটি দেশবাসীর গৌরব। ১৮৬৩ সালে প্রথম প্রবর্তনের পর থেকে কম্বোডিয়ার সব পতাকাতেই আঙ্করভাটের প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে। সারা বিশ্বে এটিই একমাত্র ভবন যা কোন দেশের পতাকায় প্রদর্শিত হয়েছে।

১৯৯০ এর দশক হতে আংকর ওয়তের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার কার্যক্রম আবার শুরু হয়। এর সাথে সাথে শুরু হয় পর্যটনশিল্প। ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সংস্থা ১৯৮৬ হতে ১৯৯২ সালের মধ্যে মন্দিরটিতে সংস্কারের কাজ করে। মন্দিরটি আংকরের বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসাবে ইউনেস্কো কর্তৃক ১৯৯২ সালে স্বীকৃত হয় এবং সপ্তম আশ্চর্যের নতুন ১৩ স্থাপত্যের তালিকায় জায়গা পায়।

২০১৫ সালে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রোলান্ড ফ্লেচার ও ড় ড্যামিয়ান 'গ্রেট অঙ্কোর প্রজেক্ট' নামে একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সেসময় তারা প্রত্নতাত্ত্বিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তীক্ষ্ণ ভূমি রাডার এবং এয়ারবোর্ণ লেজার স্ক্যানিং ব্যবহার করেছিলেন। তারা বলেন মন্দিরটির স্থাপনায় এমন কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে যা কল্পনার অতীত। স্ক্যানিংয়ে তারা এমন এক গঠনশৈলী পান যেটা আগে কখনও দেখা যায়নি। এর নাম দেন তারা 'রেক্টিলিনিয়ার স্পাইরাল' তথা 'সরলরৈখিক কুন্ডলী' যেটা মন্দিরের দক্ষিণ পাশে ৯ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে।

তারা মন্দিরের চারপাশে আরও কিছু টাওয়ারের সন্ধান পান যেগুলো মাটিচাপা অবস্থায় আছে এবং সম্পূর্ণটাই রহস্যময়।

আজ থেকে ৮০০ বছর আগে খামের সম্রাট দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ কম্বোডিয়ার নির্মাণ করে দিয়ে গেলেন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হিন্দু মন্দির যেটা প্রায় ৬০০ বছর লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল, হয়ত এখনও অনেকে এই বিষয় অজ্ঞাত।

আঙ্কোরভাটের সৌন্দর্য শুধু বলে বা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। এর সামনে দাঁড়িয়ে বুঝেছিলাম বর্তমানের এই অমিকে ইতিহাসেও হারিয়ে ফেলা যায়। মেইন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়ের দৃশ্যের সৌন্দর্য সত্যিই অনবদ্য। ভোর চারটা থেকে মন্দিরের বাইরে আমরা সপরিবারে অপেক্ষায় বসে ছিলাম পরপর দু'দিন। শুধু কিন্তু আমরা চারজনই নয়। ওখানে পৌঁছে গিয়ে দেখলাম সাথে রয়েছে আরও হাজার-খানেক ট্যুরিস্ট। উল্টোদিকের মন্দিরের বিভিন্ন সুসজ্জিত সিঁড়িতে, দরজায় এমনকি জানালায় উপচে পড়া মানুষের ভিড় -- সবাই রয়েছে সূর্যোদয় দেখার প্রতীক্ষায়।

সিয়েম রিপে চারদিনে দেখলাম অসংখ্য মন্দির, ভাসমান গ্রাম --- জলের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সম্পূর্ণ গ্রাম। শুধু নৌকোতে করেই সেখানে যাতায়াত। আমরাও নৌকোতে চড়েই সেখানে গেলাম। জলের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করলাম আর সেখান থেকে দেখা অপরূপ সূর্যাস্ত স্মৃতির পটে ছবি হয়ে রয়ে গেলো চিরদিনের মতো।

ছুটির শেষ মানেই ঘরে ফেরার ডাক। কম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাট বা মন্দিরের শহরে চারদিনের ভ্যাকেশন যেন নিমেষে কেটে গেলো। এক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমরা ফিরে এলাম আটলান্টায়। নিজের হাতে ছুঁয়ে আসা আঙ্কোরভাটকে আজও স্বপ্নে দেখা অবিশ্বাস্য এক মন্দির বলেই মনে হয়।

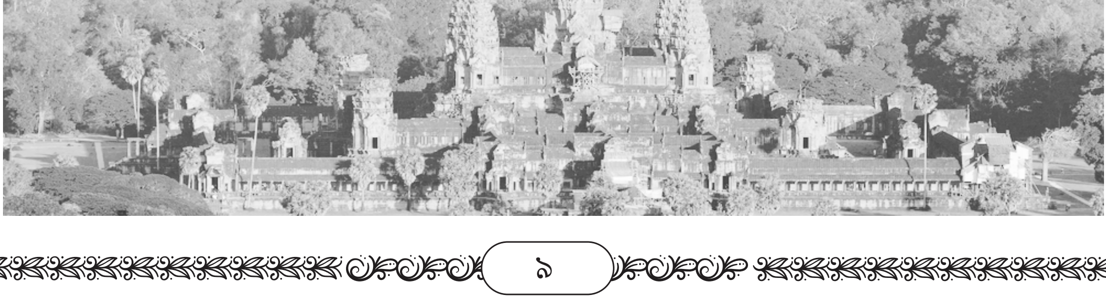

শ্রদ্ধার্ঘ্য

গীতিকার অতুল প্রসাদ সেন এক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব

মিঠুন রায়

অতুল প্রসাদ সেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংগীত জগতে এক পরিচিতি নাম। অনন্য প্রতিভাধর অতুল প্রসাদ সেন ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। সর্বোপরি একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি সংগীতের মধ্যে দিয়েই নিজের জীবনের দুঃখ, যন্ত্রণা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ গানই হয়ে উঠেছে করুণ রস-প্রধান। অতুল প্রসাদের সংগীত রীতির অন্তলীন মায়া এবং মমতা তাঁকে অন্যের চেয়ে বরাবর পৃথক করে রেখেছে। ব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যেও তেষট্টি বছরের পার্থিব জীবনে তিনি লিখেছেন ২০৮ টি গান।

অতুল প্রসাদ সেন শৈশবেই পিতৃহারা হন। ভগবদ্ভক্ত, সুকণ্ঠ গায়ক ও ভক্তিগীতি রচয়িতা মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের আশ্রয়ে তিনি বড় হন। বলতে গেলে মাতামহের কাছেই সঙ্গীত ও ভক্তিমূলক গানে তার হাতেখড়ি। বাবা রামপ্রসাদ সেনও ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। বলা যেতে পারে, অতুল প্রসাদের চেতনায় গান এসেছিল সেই সূত্রে। অতুল প্রসাদের লেখা প্রথম গানটি ছিল---

'তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া।'

তখন তার বয়স সবে মাত্র ১৪-১৫। যৌবনের প্রারম্ভে আঘাত পান এই মরমী শিল্পী। নিজের বিধবা মা হেমন্ত শশী বিয়ে করলেন ব্রাহ্ম নেতা দুর্গামোহন দাশকে। এ ঘটনায় স্তম্ভিত হন তিনি। ১৮৯২ সাল। অভিমানে অতুল প্রসাদ ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডনে যান। সেখানে তার বড় মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কন্যা সুগায়িকা হেম কুসুমের প্রেমে পড়েন তিনি। নিজের মামাতো বোন হেম কুমুমকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এ ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি উঠল। অতুল প্রসাদ নিজের সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। ভারতবর্ষে তখন এরকম ভাই-বোনের বিয়ে গ্রহণ যোগ্যতা ছিল না। ব্যারিস্টার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের পরামর্শে অতুল প্রসাদ ১৯০০ সালে স্কটল্যান্ডে গিয়ে মামাতো বোন হেম কুসুমকে বিয়ে করেন। স্কটল্যান্ডে এ রকম বিয়ে অবশ্য আইনসিদ্ধ ছিল। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকা হল না। আর্থিক সঙ্কট যে দাম্পত্য জীবনে প্রকট হয়ে উঠে। দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম হলেও একটি সন্তানের মৃত্যু হয়। ১৯৫২ সালে একমাত্র জীবিত পুত্র সন্তানকে নিয়ে অতুল প্রসাদ কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু আত্মীয় পরিজন সহ অন্যান্যরা কেউ অবশ্য তাদের দিকে ফিরে তাকাননি।

একপ্রকার বাধ্য হয়ে অতুল প্রসাদ লখনউ চলে আসেন। এদিকে দ্বিতীয় স্বামী দুর্গামোহনের মৃত্যুর পর হেমন্তশশী চলে আসেন পুত্র অতুলপ্রসাদের সংসারে। পুত্রবধূ হেমকুসুমের সাথে নিত্য বিবাদ হয় হেমন্তশশীর। এমর্মে অতুলপ্রসাদ খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। হেমন্তশশীর মৃত্যুর পর ঘরে তাঁর ছবি টাঙানো ছিল। তা সরিয়ে ফেলার দাবি তুলেন হেমকুসুম। অতুলপ্রসাদ বুঝতে পারেন মৃত শাশুড়ির প্রতি তার অভিমান এখনও কমেনি। কিন্তু সন্তান হয়ে মায়ের ছবিটুকু সরাতে অস্বীকার করেন অতুলপ্রসাদ। তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়। একসময় হেমকুসুম চিরদিনের জন্য স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যান। বিরহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সংগীতকেই তিনি বেছে নিলেন নিত্য সহচর হিসেবে। ডুবে গেলেন সংগীত সাধনায়।

বাউল-কীর্তন, ভাটিয়ালি গান খুব ভালোবাসতেন। অতুল প্রসাদের বিশেষত্ব হল তিনি বাংলা গানের সুর-তালের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেই হিন্দুস্থানী রীতির প্রয়োগ করতে সমর্থ হন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন দুটি বিশেষ গান— 'প্রভাতে যারে নন্দে পাখি' এবং 'জয়তু জয়তু কবি'।

তিনি প্রথম বাংলায় গজল রচনা করেন। তাঁর রচিত গজলের সংখ্যা ৬-৭টি। গীতিজ্ঞ গ্রন্থে তার সমুদয় গান সংকলিত আছে। তাঁর লেখা উল্লেখিত কয়েকটি গান হল--মিছে তুই। ভাবিস মন, সবারে বাসরে ভালো, নিঁদ নাহি আঁখি পাতে, একা মোর গানের তরী, কে আবার বাজায় বাঁশী প্রভৃতি।

অতুল প্রসাদ সেন একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। মাতামহ কালী নারায়ণ গুপ্তের অনুপ্রেরণাতেই তিনি রাজনীতির প্রতি আসক্ত হন। বিশেষ করে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, আনন্দ মোহন বসুসহ বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বক্তব্য তাঁকে আকর্ষণ করে। রাজনীতিতে তিনি কখনো

গোষ্ঠীবাজি পছন্দ করতেন না। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, জহরলাল নেহেরু থেকে শুরু করে পন্ডিত মদনমোহন মালব্য, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, অ্যানি বেসান্ত-এর মতো ব্যক্তিদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল।

তবে রাজনীতির চেয়েও তার ভালোবাসার বিষয় ছিল সংগীত। তাঁর প্রিয় রাগ ছিল খাম্বাজ ও ভৈরবী। দেশপ্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বরভক্তি এবং প্রেম হচ্ছে তাঁর গানের প্রধান বিষয়। তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক সংগীতগুলির মধ্যে— বলো বলো বলো সবে, হও ধরমেতে ধীর, মোদের গরব- মোদের আশা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনেকেই মনে করেন যে, অতুল প্রসাদ মূলত লখনউতেই সংগীত সাধনার সুযোগ পান। এখানেই তিনি উর্দু ভাষা শিখলেন। হরিজন মানুষদের উন্নয়নের পাশাপাশি কাশীতে বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অতুলপ্রসাদের বিরাট ভূমিকা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। ১৮৯৬ সালে কবিগুরু প্রতিষ্ঠা করেন 'খামখেয়ালী সভা'। এই সংগঠনের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন অতুল প্রসাদ। এই সংগঠনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেকেই সম্মানিত সভ্য ছিলেন। লখনউর কেশরবার্গে বিশাল বাড়ি করেছিলেন অতুলচন্দ্র। এখানে নিয়মিত গানের আসর বসত। দিলীপ কুমার রায়, পাহাড়ী সান্যাল, সাহানা দেবীকে নিজের হাতে তালিম দিয়ে তৈরি করেছেন।

ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ লখনউয়ে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেন। এলাহাবাদ, কাশীসহ নানা শহরের প্রবাসী বাঙালিগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সভামুখ্য অতুলপ্রসাদ গুনীজন সংবর্ধনার পাশাপাশি সাহিত্য সম্মেলনের পত্রিকা 'উত্তরা' প্রকাশ করেন। বহু সামাজিক কর্মকান্ডে তিনি যুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনে নিজের মায়ের নামে চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অতুল প্রসাদ তাঁর সমগ্র জীবনের উপার্জিত অর্থের বৃহৎ অংশ জনকল্যাণে ব্যয় করে গেছেন। এমনকি তিনি তাঁর বাসগৃহ ও গ্রন্থস্বত্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে দান করে গেছেন। তাইতো প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী বিরলপ্রজ ব্যক্তিত্ব।

Restaurant
Indrani

Prop. Ratan Deb
9436121216/ 9774774246
Battala, Agartala, Tripura (W)

শ্রদ্ধার্ঘ্য

কথাসাহিত্যিক সুবিমল রায় আমাদের অভিভাবক

সুজয় রায়

কথা সাহিত্যিক সুবিমল রায় আমার দাদা। আমাদের পরিবারে তাঁকে আমরা ' ছোড়দা' ডাকতাম। আমাদের ভাইবোন ছ'জন। চার ভাই। দুই বোন। দিদিরা ভাইদের বড়। বড়দি এবং ছোড়দি। ভাইরা হলেন বড়দা এবং ছোড়দা। আমার ইমিডিয়েট বড় জন শুধু ছোটদের কাছে ফুলদা।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমরা সবাই তখন এপাড়ে চলে আসি। বড়দা, ছোড়দাকে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়। বড়দির বিয়ে হয়ে যায় গ্রামে থাকতেই। ছোড়দি চলে আসে আগেই মামার সাথে কলকাতায়। অর্থাৎ আমাদের পরিবারের আট জনের মধ্যে চারজন আগেই এপাড়ে চলে আসে। আমরা চারজন আসি অনেক পরে, আগরতলায়। তখন মামার বাসস্থানে এসে উঠি।

ছোড়দা কলকাতায় কাকার বাড়িতে অনেক আগে থেকেই। সেখানে থেকেই ছোড়দা পড়াশুনা করে। বড়দা তখন বড়দির বাড়িতে বাঁকুড়ায়। আমরা তখনও মামার বাড়ির আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছি। মা তখনও নিজের সংসার গড়ে তুলতে পারেনি। স্বপ্ন দেখে ছেলে বড় হয়ে পড়াশুনার শেষে কবে চাকরি করবে? স্বাবলম্বী হয়ে আলাদা সংসার গড়ে তুলবে? আর মা স্বপ্ন দেখে এই ছোড়দাকে দিয়েই। ছোড়দাও তখন মায়ের ঐ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য ম্যাট্রিক পাস করে আগরতলায় মামার বাড়িতেই চলে আসে। আগরতলায় এসে ভর্তি হয় এমবিবি কলেজে। একটা সময়ে বিএসসি পাস করে। চাকরির জন্য তৈরি হয়। পেয়ে যায় শিক্ষা দপ্তরের ট্র্যান্সলেটারের চাকরি। আর ঐটুকু এক চাকরির জেরেই, মায়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আলাদা বাড়ি ভাড়া করে সবাইকে নিয়ে চলে যায় নতুন সংসার পাতার জন্য।

একদিকে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন, অন্যদিকে নিজস্ব গুণগুলির প্রকাশ ঘটতে থাকে ছোড়দার। ধীরে ধীরে ছোড়দাই হয়ে উঠেন সুবিমল রায়।

কলেজে পাঠ করার সময়েই দাদা 'গল্প' লেখেন। কলেজ ম্যাগাজিন 'প্রাচী'তে ছাপা হয় তাঁর গল্প। প্রথম গল্প, 'মা'র গল্প। আমার মায়ের কাছ থেকে দাদা গল্প শুনে গল্পটা লিখেছিলেন বলে তার নাম দিয়েছিলেন 'মা'র গল্প। আর ওখান থেকেই দাদার তথা সুবিমল রায়ের লেখালেখি জীবন শুরু।

বেড়ে ওঠে বন্ধুবান্ধব। কিন্তু দাদার, তা সত্ত্বেও সংসারের কাজে এতটুকু গাফিলতি ছিল না। আমাদের দুই ভাইকে দাদা নিজে গিয়ে ভর্তি করান স্কুলে। উমাকান্ত প্রাইমারি এবং বিজয়কুমার প্রাইমারিতে দু'জনেই ভর্তি হলাম। স্কুল চালানো, পড়াশুনার দেখাশোনা-সবটাই করতেন দাদা, সুবিমল রায়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হয় আগরতলা। মামার বাড়িতে ঠাঁই। বাবা ওখানে ছিলেন পোস্টমাস্টার। এখানে এসে বেকার। ফলে দাদার ঐ ছোট্ট চাকরির ওপরই আমাদের পাঁচজনের সংসার। বড়দা তখনও বড়দির বাড়ি বাঁকুড়াতে। সেখান থেকে অতি সামান্য একটা চাকরি পেয়ে চলে যান মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর। ওখানে এর আগে চারজন গিয়েছিলাম। সামান্য বচসার কারণে বড়দার

চাকরিটা চলে যায়। সুতরাং ফিরে আসি আগরতলায় মামার বাড়ি। কিছুদিনের মধ্যে ছোড়দা কলকাতা হিন্দুস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে আগরতলায় এসে মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে ভর্তি হন। বিজ্ঞানের ছাত্র। বিএসসি পাস করে ঐ সামান্য চাকরিটি পাওয়া। ঐ সময়ে পরিবারের যা অবস্থা, যেকোন একটা চাকরি পাবার দরকার হয়ে পড়েছিল।

আমরা গেলাম আলাদা ভাড়া বাড়িতে। সেটা মেলারমাঠ, নদীর পাড় এলাকা। এর কিছুদিন পর আমরা পরের দুই ভাই ভর্তি হই প্রাইমারি স্কুলে। আমি ভর্তি হয়েছিলাম ক্লাস ফোরে।

লেখালেখির পরও সুবিমল রায় রবীন্দ্র সঙ্গীতকে আপন করে নিয়েছিলেন। সাহিত্যচর্চা ও সঙ্গীতচর্চা দুটোই চলছিল পাশাপাশি। খেলাধূলা ভালবাসতেন। খেলতেন ক্রিকেট। কলেজ মাঠে একসময় দাদার সাথে আমিও তাদের ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গেছি। ঐ সময়ে আগরতলা শহরে নামী ক্রিকেটারদের নিয়ে ম্যাচ হতো। জমকালো খেলা। এক নম্বর কলেজ হোটেল মাঠ তখন খেলা দেখার জন্য ভিড় হতো ক্রিকেট প্রেমীদের।

দাদার অর্থাৎ সুবিমল রায়ের আর একটা নেশা ছিল ভাল ক্যামেরায় ছবি তোলার। চমৎকার সব সাদা-কালো ছবি তুলতেন তিনি। আর দিতেন বিশুদ্ধ আড্ডা। বাড়িতে বসতো আড্ডার আসর। গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, তপন ভট্টাচার্য, মৃণাল কর, অমিতাভ ঘোষ, রমাপ্রসাদ দত্ত (পল্টু দা), আশিস চক্রবর্তী, দেবদাস গাঙ্গুলি, সমীর দাস, সুপ্রিয় ভৌমিক, ব্রজগোপাল সিংহসহ অনেকেই আড্ডা দিতেন। গানের চর্চাও হতো। সুবিমল রায়ের আড্ডার আরো জায়গা ছিল। মোটরস্ট্যান্ডের সমাচার পত্রিকা, ওরিয়েন্ট চৌমুহনীর কাছে সংবাদিক নেপাল দে'র প্রেস। কিংবা বলা যায় তাঁর পত্রিকা সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি'র অফিসঘর। সেখানেও আসতেন কলেজের নবীন, প্রবীণ অধ্যাপক, লেখক কবি ও বুদ্ধিজীবিরা। সুবিমল রায় পরবর্তী সময়ে আড্ডা দেন তপন ভট্টাচার্যের বাড়ি, মৃণাল করের বাড়িসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠিতদের বাড়িতে।

পরবর্তী সময়ে আড্ডা হতো দৈনিক সংবাদ, স্যন্দন পত্রিকা অফিসে। দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিকের সাথে ছিল সুবিমল রায়ের গভীর অন্তরঙ্গতা।

সুবিমল রায় ছিলেন রাজ্যের বিশুদ্ধ রবীন্দ্র সংগীত চর্চার ধ্রুপদী ঘরানার শেষ প্রতিনিধি। গত ২৮ আগস্ট ভোর রাতে এই প্রবীণ কথাসাহিত্যিক চলে গেলেন না ফেরার দেশে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সংস্কৃতি জগতে এক গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তিনি দীর্ঘদিন তিনি রবীন্দ্র পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়াও আরো নানা সংগঠনের সঙ্গে সভাপতি বা সম্পাদক হিসাবে জড়িত ছিলেন তিনি। সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি ত্রিপুরা সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কারসহ নানা সম্মাননা পেয়েছেন। ছোটবড় মিলে তাঁর লেখা গদ্য সাহিত্যের সংখ্যা প্রায় কুড়িটি। প্রতিদিন নিয়ম করে দু'তিন ঘণ্টা লেখালেখি করতেন। তবে আজীবন তাঁর আগ্রহ ও সাধনা ছিল মূলত রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই। বিশেষত রবীন্দ্র সংগীত চর্চার ধ্রুপদী ঘরানাকে পছন্দ করতেন সুবিমল রায়।

অনেক কীর্তি ও অবদান রেখে গেছেন সুবিমল রায়। সব কিছু এই পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তাঁর প্রয়াণে ক্ষতি হলো সাহিত্য ও সঙ্গীত জগতের। এ ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। সবার সাথে আমিও তাঁকে প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই।

With Best Compliments From ....

PARITOSH DEBNATH

Govt. Contractor & Order Suppliers

Office : Ranir Bazar, Debinagar

Happy Durgapuja

শ্রদ্ধার্ঘ্য

অন্তর্ভেদী গল্পকার মানস দেববর্মণ

প্রবীর সরকার

বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন ত্রিপুরার গল্প রচনার ভগীরথ ছিলেন প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পকার বিমল চৌধুরী। কামান চৌমুহনীস্থিত তাঁরই ঢাকা মহাশক্তি ঔষধালয়ে নিয়মিত আড্ডাধারী তিন তরুণের হাতে ত্রিপুরার গল্প সাহিত্য সাবালকত্ব অর্জন করে। তাঁদের প্রথম দু'জন ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য ও কালীপদ চক্রবর্তী আগেই প্রয়াত হয়েছেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হলেন মানস দেববর্মণ। কখনো 'ত্রিমূর্তি', কখনো 'ত্রিফলা', কখনো 'ত্রিরত্ন' হিসেবে চিহ্নিত হতেন এই তিনজন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য ও কালীপদ চক্রবর্তী শুধু গদ্য রচনাকার হিসেবেই চিরস্মরণীয় হলেও মানস দেববর্মণের প্রথম পরিচয় কিন্তু কবি হিসেবেই। কবিতা রচনায় তিনি এতটাই শক্তিমান ছিলেন যে এই রাজ্যের প্রথম কাব্য সংকলন, আজ পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'দ্বাদশ অশ্বারোহী'র এক অশ্বারোহী ছিলেন মানস দেববর্মণ। ১৯৭২ সালে নিলীপ পোদ্দারের 'পৌণমী' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 'দ্বাদশ অশ্বারোহী' সম্পাদনা করেছিলেন ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান কবি ও বিশ্রুত সাহিত্যপত্র 'নান্দীমুখ' সম্পাদক স্বপন সেনগুপ্ত। রণেন্দ্রনাথ দেব, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ, মিহির দেব, প্রদীপ বিকাশ রায়, অপরাজিতা রায়, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, পীযূষ রাউত, শঙ্খপল্লব আদিত্য, স্বপন সেনগুপ্ত ও মানিক ধরের (বিমান ধর) পাশাপাশি মানস দেববর্মণের নির্বাচন নিয়ে যেমন সম্পাদক বা প্রকাশক নিঃসংশয় ছিলেন, তেমনি এই রাজ্যের তখনকার বিদগ্ধ কবিতা পাঠক বা কবিতা প্রেমীরাও বিনা সংশয়ে মেনে নিয়েছিলেন। বিগত শতকের ছয়ের দশকে মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণিতে পঠনকালে এবং কলকাতায় স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পঠনকালে তিনি কবিতা রচনাতেই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। কলকাতায় 'সংসপ্তক' নামে একটি কবিতাপত্রও সম্পাদনা করেছেন তিনি।

কবি মানস দেববর্মণ কলকাতা থেকে ফিরে এসে কবিতাকে একপাশে সরিয়ে রেখে কি করে বা কেন গল্প রচনায় মশগুল হলেন তা নিয়ে তখনকার সাহিত্য অঙ্গনে কম আলোড়ন তৈরি হয়নি। সাকুল্যে পঁচিশ/ত্রিশটি গল্পই তিনি লিখেছেন। কিন্তু তাতেই নিজেকে গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর 'স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী' কিম্বা 'পাঁচ টাকা দশ টাকার গল্প' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন শক্তিমান গল্পকার হবার মতো কব্জির জোর তাঁর ছিলো। পরবর্তী সময়ে এম বি বি কলেজে অধ্যাপনা, টি পি এস সি'র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন, অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য ও কালীপদ চক্রবর্তীর মৃত্যু এবং ইউ পি এস সি'র সদস্য হয়ে দিল্লিতে অবস্থান তাঁর সৃজনশীলতাকে কেড়ে নিয়েছে। অবশেষে মৃত্যু এসে ইতি টেনে দিলো কলালক্ষ্মীর অন্যতম বরপুত্রের যাবতীয় তৎপরতা। দিলখোলা, তুখোড় আড্ডাবাজ মানস দেববর্মণ চলে গেলেন, রেখে গেলেন 'পৌণমী প্রকাশন' প্রকাশিত দুটি গল্পগ্রন্থ 'পাঁচ টাকা দশ টাকার গল্প' এবং 'গল্প সমগ্র'।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

কথাকার মানস দেববর্মণ

রঘুনাথ সরকার

কথাশিল্পী মানস দেববর্মণের সঙ্গে যে কবে আমার পরিচয় হয়েছে তা এখন মনে করতে পারছি না। সম্ভবত তিনি যখন টি পি এস সি'র সদস্য মনোনিত হলেন। এর কিছুদিন পর ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তখনই জানতে পারলাম যে তিনি এম বি বি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সেই কাজ ছেড়ে তিনি টি পি এস সি'তে যোগ দিয়েছেন। কলেজে তিনি খুবই পপুলার অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই তিনি প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। মানস দা ১৯৪২ সালের ২৯ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণনগরে। পড়াশোনা শুরু করেন উমাকান্ত একাডেমীতে। এরপর তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। ওখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে আগরতলা চলে এসে এম বি বি কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। পরে তিনি টি পি এস সি'র সদস্য মনোনীত হন। তিনি ১৯৮৭ সালে টি পি এস সি'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই পদে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে সর্বভারতীয় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য মনোনীত হয়ে কর্মস্থল দিল্লিতে চলে যান। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরা থেকে একমাত্র তিনি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হয়েছেন। খুব সুনামের সাথে এই পদে তিনি কাজ করে গেছেন। তিনি একদিকে যেমন একজন গল্পকার, তেমনি তিনি একজন কবিও বটে। অনেক গল্প কবিতা লিখেছেন। যা পাঠকের কাছে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। ওনার বিশেষ বন্ধুদের মধ্যে লেখালেখি নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা চলতো। তাদের মধ্যে ছিলেন কার্তিক লাহিড়ী, কালিপদ চক্রবর্তী, বিমল সেনগুপ্ত। রাজ্যে বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। জনযুগ পত্রিকা ও ত্রিপুরা দর্পণ এই পত্রিকাগুলিতে ওনার অনেকগুলো লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া তিনি নাট্যমঞ্চ আলোড়িত এল ডি সি এবং সি এ এ সি টি'র সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আগরতলা ফ্লিম সোসাইটির সদস্যও ছিলেন। মানসদা ব্যক্তিগত জীবনে খুবই আড্ডাপ্রিয় ছিলেন। কারোর সঙ্গে পরিচয় হলে দীর্ঘক্ষণ বসে আড্ডা দিতেন। আর খুবই ধূমপান করতেন। অনেক সময় আমার সঙ্গে দেখা হলে বলতাম, মানসদা এত সিগারেট খাবেন না। আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে। তিনি বলতেন - জীবনটা উপভোগ করার জন্য। আমার কিছু হবে না। শেষ জীবনে তিনি আড্ডা দিতেন ওরিয়েন্ট চৌমুহনী শ্যামল ভট্টাচার্যের আনন্দবাজার পত্রিকা বিক্রয় কেন্দ্রে। প্রতিদিন একটা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত। আর ওনার সঙ্গে থাকতেন শ্রদ্ধেয় বিমান ধর ও কুমুদ সাহা। এই সময় ঐখানে আমাকে মাঝে মাঝে যেতে হতো পত্রিকার জন্য। তখন দেখতাম তাঁরা তিনজন বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। চা খাচ্ছেন। তবে মানসদার মুখে কিন্তু ওনার প্রিয় সিগারেটটি থাকতো। আমি বলতাম সিগারেটটি ফেলে দিন। উনি হাসতেন।

তিনি যে নেই তা এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা। মানস দেববর্মণের মতো ব্যক্তিরা হারিয়ে যেতে পারে না। তার চিরদিন আমাদের অন্তরের মধ্যে আছেন ও থাকবেন। তাঁকে প্রণাম।

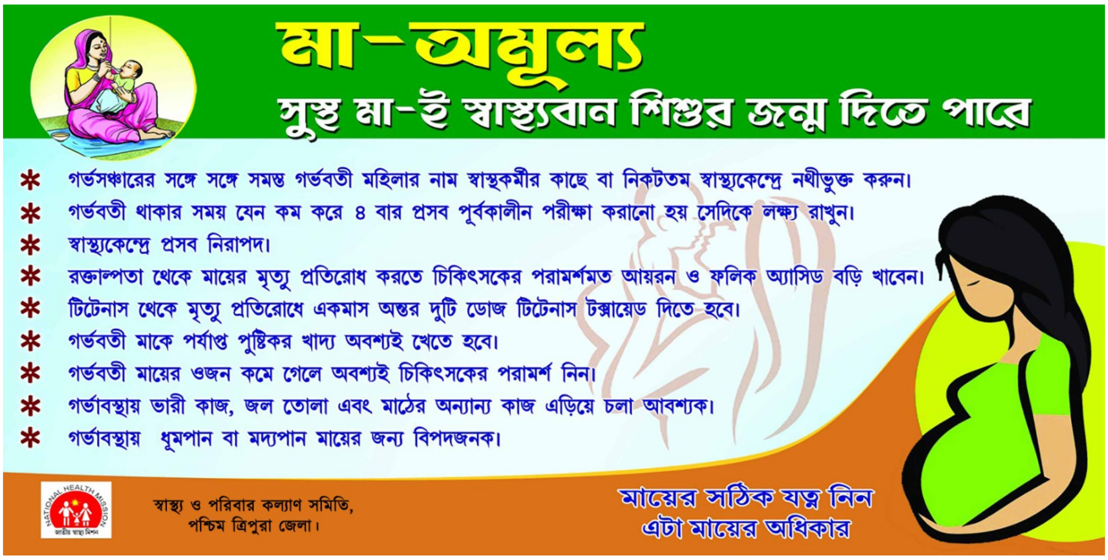

এখন চোখ-কান খোলা রাখার লড়াই

ভবানী বিশ্বাস

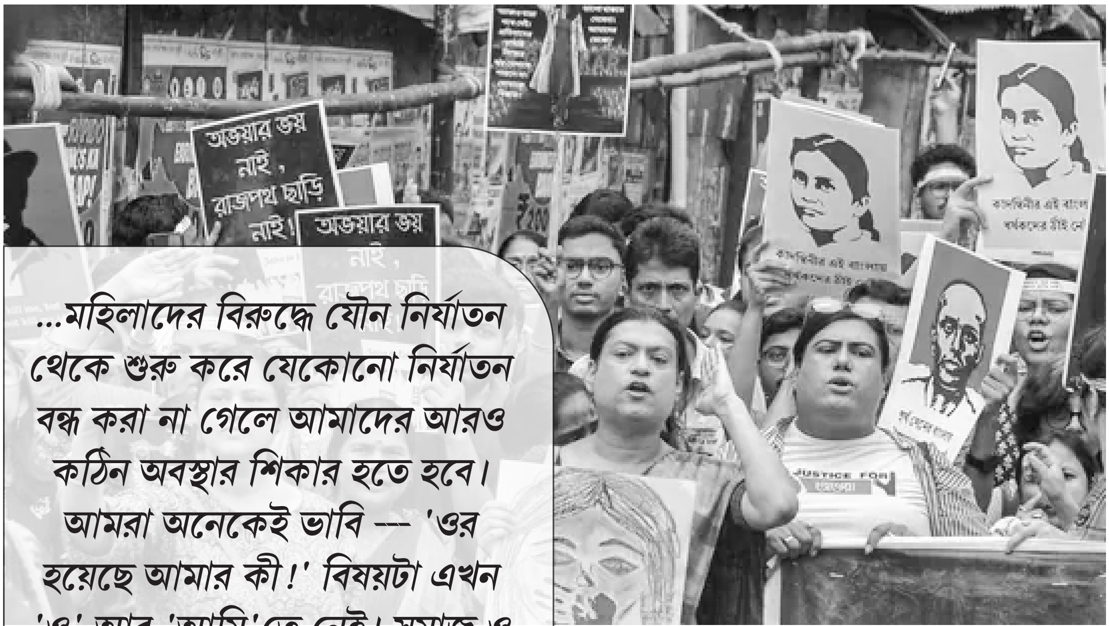

...মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন থেকে শুরু করে যেকোনো নির্যাতন বন্ধ করা না গেলে আমাদের আরও কঠিন অবস্থার শিকার হতে হবে। আমরা অনেকেই ভাবি --- 'ওর হয়েছে আমার কী!' বিষয়টা এখন 'ও' আর 'আমি'তে নেই। সমাজ ও দেশের সমস্যা মানেই নিজের সমস্যা। প্রতিবেশির ঘরে আগুন লাগলে তা আমার ঘরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বন্যার পর তখন সাব্রুম-আগরতলা ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিলো। আমরা যারা দক্ষিণ ত্রিপুরায় থাকি তাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট সমস্যা। প্রায় সপ্তাহখানেক তো সড়ক পথেই ঠিকমতো যোগাযোগ হচ্ছিল না। বাসেই যাতায়াত করতে হয়েছে আমাদের।

সেদিন বিলোনীয়া থেকে আগরতলার ডাইরেক্ট বাসে উঠলাম। বাসের সিটগুলি তুলনায় ছোটো। তাই একজনের গায়ে অর্থাৎ হাতে আরেকজনের হাত লেগে যায়। যদিও কেউ ইচ্ছে করে লাগাচ্ছেন না। প্রথমত প্রচন্ড গরম, তার উপর গায়ে লাগালাগি- একেবারে অসহ্য। পাশের সিটে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী ভদ্রলোক, যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান। ইদানিং আমার স্বাস্থ্য যে কমছে তা'ও নয়। সারাক্ষণ উনার ডান হাতের সাথে আমার বাঁ-হাত লেগেই আছে। খুব বিরক্ত লাগছিল, কিন্তু উনার কোনো দোষ নেই এটা বুঝেছি। তখন সম্ভবত বিশালগড়। উনি জিজ্ঞেস করলেন

--- কই যাইবা তুমি ?

--- আগরতলা

--- আগরতলা কী কর ? চাকরিবাকরি নি ?

--- আমি এককথায় জবাব দিলাম---না।

তারপর বললেন --- তোমার বাড়ি ঋষ্যমুখ না ?

বললাম --- হ্যাঁ।

জাস্ট এতটুকুই। আমি আর একটা কথাও বাড়ালাম না। বুঝলাম উনি আমাকে চেনেন। কিভাবে চেনেন, জানি না। জানার ইচ্ছেও হয়নি। তখন খিটখিটে মেজাজ হয়ে আছে। উনি ভাল করেই বুঝেছেন যে আমার কথা বলার আগ্রহ নেই। তাই উনিও নীরব। যাইহোক, দু'জনের নীরবতার মধ্য দিয়েই পৌঁছে গেলাম আগরতলা।

একদিন পর ভোরের বাসেই ফিরছিলাম। ডাইরেক্ট বাস, বাড়ির সামনে নামব। সিটগুলিও বেশ বড়। তাই একটা লম্বা ঘুম দিলাম। প্রায় দু-ঘন্টা বেশ আরাম করেই ঘুমালাম। সাধারণত বাসে ঘুমাই না। কিন্তু শরীরটাও ক্লান্ত, দু-রাত ঠিকমতো ঘুমও হয়নি তাই...। যাইহোক, বিলোনীয়ায় বাস দাঁড়ালো প্রায় দশ মিনিটের মতো। চোখমুখ ধুয়ে জল বিস্কিট খেলাম। বেশ ফ্রেস লাগছে এখন। একটু পর বাস ছাড়বে। একজন লোক এসে আমার পাশের সিটে বসলেন, বেশ স্বাস্থ্যবান। আমি মোবাইলে পত্রিকা পড়ছিলাম। বুঝতে পারছি উনি আমার মোবাইল লক্ষ্য করছেন। তারপর গান চালিয়ে দিয়েছি, শুনছি।

বাসও চলছে, আর আধঘন্টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছব। বেশ ভালোই লাগছে।

কিন্তু এরমধ্যেই পাশের সিটের লোকটি উনার ব্যাগ জড়িয়ে ধরে আছেন। যদিও আমিও আমার কলেজ ব্যাগটা এভাবেই জড়িয়ে ধরে বাস বা ট্রেনে বসি। এটা কোনো ব্যাপার না। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে উনি এমনভাবে বসেছেন যে উনার বাঁ-হাতের আঙুলগুলি আমার ডান হাতে লাগছে। আমি মোবাইল টিপছি, কিন্তু আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রথম ভাবলাম হাত তো লাগতেই পারে। আমি একটু হালকা সরে বসলাম। একটু পর আবার উনার হাতটা লাগছে। এবার বুঝলাম সুন্দর পোশাক পরা লোকটি ইচ্ছে করেই এমন করছেন। আমি জাস্ট ওনার দিকে তাকালাম। ওই মূহূর্তে ঠিক যেমনভাবে তাকানো দরকার, ঠিক তেমনভাবেই তাকালাম। উনি সামনের দিকে চেয়ে আছেন। ঠিক বুঝেছেন যে আমি ওনার দিকে তাকিয়ে আছি। মুহূর্তের মধ্যেই হাত পা সব গুটিয়ে ভেজা বেড়ালের মতো হয়ে গেছেন। আমি তখন আর কিচ্ছু বলিনি।

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করালাম ---

দাদা, কই যাইবেন ?

একটু কাশি দিয়ে বললেন --- ঋষ্যমুখ।

বললাম --- আইচ্ছা। ঋষ্যমুখ আন্নে চাকরিটাকরি করেন নিকি ?

বললেন --- না।

আর কিচ্ছু বললেন না। এবার আমি বললাম --- দাদা, কন্দুর আগে যে আন্নে আঁর লগে দুষ্টমি কইরছেন ভবিষ্যতে আর কেউর লগে ন করিয়েন। কারণ, কওন তো যায় না ভবিষ্যতে জিয়ার লগে এ ব্যবহার কইরবেন হিয়া যদি রাগ করি আন্নেরে কিছু প্রসাদ দিই দেয়...

--- উনি কিছু বললেন না।

আমিও আর কথা বাড়ালাম না।

তবে উনি আমার এটুকু কথার চাপে চালিতাখলা নেমে গেছেন। ঋষ্যমুখ অব্দি আর আসতে পারেননি। যদিও তাকে ঋষ্যমুখের লোক বলে আমার মনে হয়নি।

আমার সাথে ঘটা এই ঘটনাটা বললাম কারণ--- চারপাশের পরিবেশ ভালো নয়। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আরও। বাড়িতে এসে কথাগুলো আমার ছাত্রছাত্রীদেরও বললাম। বলা দরকার বলে মনে হল। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই বিপদ। উভয়কেই সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একে অপরকে সাহায্য করতে হবে।

সামাজিক অবক্ষয়ে চারপাশের পরিবেশ আসলেই দূষিত হয়ে যাচ্ছে...

এই যে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের নৃশংস ঘটনা--- তা আমরা কমবেশি সবাই জানি। ওখানে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার সাথে যুক্তদের বিচারের দাবিতে এখনও আন্দোলন চলছে। এতে সামিল জুনিয়র ডাক্তারসহ অন্যান্য প্রায় সকল শ্রেণির মানুষ। সারা দেশেই মহিলাদের উপর নির্যাতন, বিশেষ করে ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে চলেছে। আমাদের ত্রিপুরাও এর ব্যতিক্রম না। কিছুদিন আগে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমের মনু থানা সংলগ্ন কোনো এক এলাকায় এক নাবালিকাকে তিন নাবালক মিলে চারদিন ধরে ধর্ষণ করেছে। এতেই শেষ নয়, ধর্ষকরা এতটাই হিংস্র জন্তু হয়ে ওঠে যে নাবালিকার যৌনাঙ্গে গরম জল ঢেলে দেয়। ভাবলেই বুকটা কেঁপে ওঠে। দেশে আইন আছে, শাস্তির বিধান আছে, অনেক ঘটনায় কঠোর শাস্তিও হচ্ছে। আছে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন করার সরকারি চেষ্টাও। তা সত্ত্বেও এসব বন্ধ হচ্ছে কই? সুযোগ পেলেই অভয়া, তিলোত্তমাদের খুবলে খাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। মধ্যযুগীয় এই বর্বরতা আর ক'দিন চলবে ?

বিকৃত যৌনতা ও পশ্চাদপদ মানসিকতার বিরুদ্ধে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবাইকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন থেকে শুরু করে যেকোনো নির্যাতন বন্ধ করা না গেলে আমাদের আরও কঠিন অবস্থার শিকার হতে হবে। আমরা অনেকেই ভাবি --- 'ওর হয়েছে আমার কী!' বিষয়টা এখন 'ও' আর 'আমি'তে নেই। সমাজ ও দেশের সমস্যা মানেই নিজের সমস্যা। প্রতিবেশির ঘরে আগুন লাগলে তা আমার ঘরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমরা যদি আমাদের চারপাশে সুন্দর পরিবেশ গড়তে না পারি, তবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সুন্দরভাবে বিকশিত হবে কীভাবে? সন্তানকে যদি সুশিক্ষায় গড়ে তুলতে না পারি তাহলে এসব কাজে তার জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাবে।

এখন একটা লড়াই শুরু হয়েছে। সবাইকে সচেতন করার লড়াই। আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির জন্য লড়াই। শুধু আর জি কর নয় - নিজের গ্রাম, এলাকা ও শহরে যেন এসব না হয়, তারজন্য চোখকান খোলা রাখার লড়াই। লড়াই করতে গিয়ে ভয় না পাওয়ার লড়াই। নিজের অফিসে ছেলে হোক বা মেয়ে, তার যোগ্য সম্মান পাওয়ার লড়াই। গাড়িতে কেউ মিসবিহেভ করলে তাকে তার মতো করে বুঝিয়ে দেওয়ার লড়াই। আমাদের লড়তে হবে এবং জিততেও হবে। জয় নিশ্চিত করতে হবে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য এবং অবশ্যই দেশের জন্য।

ধর্ষকেরা যখন রামধনু সাজায় আকাশে

বিষ্ণু শংকর বর্মা

দিনটি শুয়ে আছে চিতার মতো
রাতের অন্ধকার ঢেকে রেখেছে গোটা শহর
ধর্ষকের মত দাঁড়িয়ে আছে লাইট পোস্টগুলো

তুমি একা একা বাড়ি ফিরছো

কিছু মানুষ
কুকুরের মত তোমার হাড় মাংস নিয়ে
খেলেছে যেমন তেমন

কুকুর তবুও তো
প্রভু ভক্ত হয়
এই মানুষগুলো
তোমার মৃত্যুকে পালকির মতো সাজিয়ে
গোটা শহরে ফেলেছে যত সব আঁধার

দিনটি শুয়ে আছে চিতার মতো
রাতের অন্ধকার ঢেকেছে
গোটা শহর

তুমি একা একা বাড়ি ফিরছো

প্রজাপতির রং কেড়ে রামধনু সাজানোর আশ্বাস দিয়েছে অনেকে।

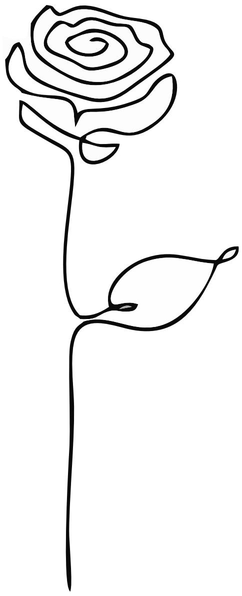

দখলে

মৌসুমী কর

আশ্বিনের সোনা গলা রোদ
ভাদ্রের দখলে
সাবেকিয়ানা পুজো
আধুনিকতার দখলে
জোছনাকে সামলে রেখে চাঁদ
মেয়েদের পাহাড়া দেয়
কারণ রাত তখন মেয়েদের দখলে
এবার পুজোয় একটাই আশীর্বাদ দাও মা
মহিষাসুর থেকে মানবাসুরে
রূপান্তরিতরা যেনো
তিলোত্তমাদের দখলে থাকে।

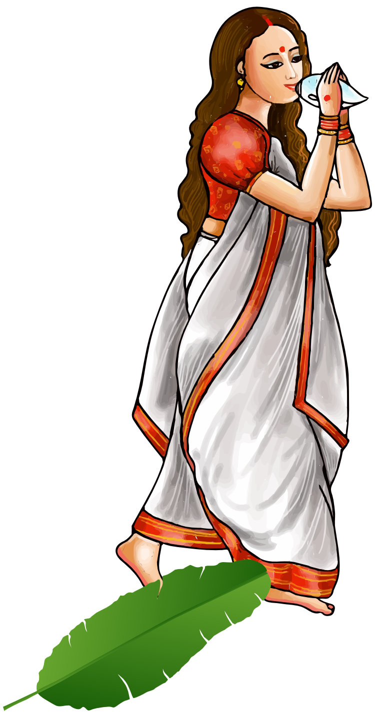

শ্রী-র অঞ্জলি !

জ্যোতির্ময় রায়

ছিঁড়ে আনা পুষ্প-বিল্বপত্রের শব্দসকল
অঞ্জলিতেই মানায়।

এতো অশ্রু ঢালছো
তোমার সংসারে
দরবার থেকে তুলে আনা
বর্ণে-গন্ধে-ছটায়
তোমার সাজানো সংসার

ময়লা পালক ধুয়ে এসে
ফিরে পেতে
ছনছাউনি ঘরের বাইরে মেলে দেওয়া
দ্বিতীয়তম কাপড়টি
যা স্মৃতির দোলনায় নিত্য

তোমার সজলচোখ
সইতে পারি না
আজ তুমি ধনবতী জনবতী
অশ্রু আজও ঝরে নিরালায়
বিনির্মাণে
আর্ত ঐ শুদ্ধমনা মানুষের জন্য

ছিঁড়ে যাওয়া অশ্রুসকল তবে কি
শ্রী-র অঞ্জলি !

ভুল ঠিকই বুঝতে পারবে

টিংকুরঞ্জন দাস

এত রক্তের দাগ
ইচ্ছে করলেই তো আর মুছে ফেলা যায় না
এত বোনের সম্ভ্রম হানি
ইচ্ছে করলেই জাতি বিস্মৃত হতে পারে না
কত মায়ের বুক খালি হয়ে যাওয়ার বিনিময়ে
অর্জিত স্বাধীনতা
ঠুনকো ঝড়েই উবে যেতে পারে না।

যদি এমন ভেবে থাকো
ভুল করেছ
ভুল করেছো হে বেয়াকুব জাতি।

সামান্য প্রাপ্তিতে তোমাদের উল্লাস
তোমাদের স্বাধীনতাকেই লজ্জিত করছে।

একবার চোখ তুলে তাকাও,
মনের চোখ খুলে দেখো
নিজের ভুল ঠিক বুঝতে পারবে।

জন্মভূমি

ডা: সুবল চন্দ্র দেব

আবার যদি আসি কখন
এই ধরণীর পরে,
আসবো জেনো আমি তখন
তোমার অতুল ক্রোড়ে।
তুমি মাত ! স্বর্গের বাড়া,
তাই স্বর্গবাসী গনে,
ত্যাজিয়া মন্দাকিনী ধারা
আসে জাহ্নবী পুলিনে।
মহিমা তোমার তত্ব করে
সত্য যে লভে, সে ধন্য,

গোলক পতি অলকা ছাড়ে
সাধে কি, তোমার জন্য !
তোমার ফুলে তোমার ফলে
তোমার স্বরূপানন্দ,
বিতরে সদায় ভৃঙ্গকুলে
সেই পরমানন্দ।

জন্ম যেথা সুখের আগার
মরণ অমৃতময়

হেথা আসতে চিত্ত আমার
নিয়ত ব্যাকুল রয়।

আলো

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী

ফুটিবে ফুল
জুড়াইবে নয়ন
ভাসিবে নৌকা
খুলিবে বাঁধন
রাঙিবে খেত
ফুটিবে হাসি
গাইবে গান
আসিবে সেদিন
ভাবিও না আর
চলো ধরি হাত
করি এ পণ
মিলি ঝুলি
লোরিব এ যুদ্ধ
করিব জয়
জালিব নতুন আলো
বাধিব নতুন বন্ধন ভুমি।

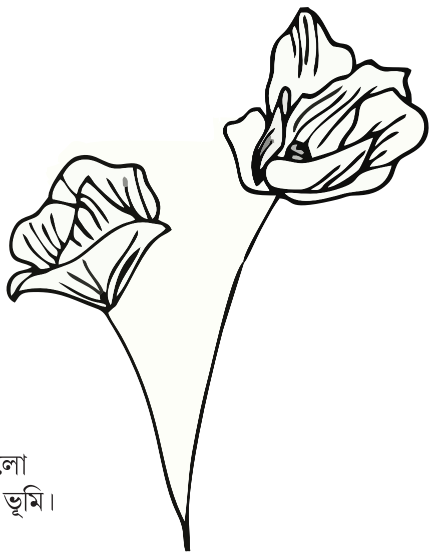

ভুলে যেও মা !

সুস্মিতা দেবনাথ

তোমাকে মা ভুলে গেলাম, তুমিও যাও ভুলে
আমার ছবি সরিয়ে রাখো, না হয় রাখো খুলে
ওই ছবিটায় মালা দিয়ে লাভ নেইকো আর
ধূপের ধোঁয়ায় ঘরটা এখন পুরো অন্ধকার।

ডাক্তারির বই বিলিয়ে দিও, গরিব ছাত্রটাকে
স্টেথোটাও দিয়ে দিও, যাকে খুশি তাকে,
আমার পড়ার টেবিল, চেয়ার বাইরে ফেলে দাও
ওসব দেখে আজও তোমরা ভীষণ কষ্ট পাও।

আমার জন্য রাতের দখল নিচ্ছে সাধারণে
পথ ঘাট সব স্তব্ধ করে দিচ্ছে জনগণে !
কলকাতাটা আমার জন্য জাস্টিস চায় আজ
এবার পুজোয় দুর্গা মায়ের বদলাবে কি সাজ !

ইচ্ছা ছিল করব পুজো, সাজব কনের সাজে
দত্যি, দানব বাধ সাধলো ইচ্ছেগুলোর মাঝে,
নামটাও মা বদলে গেছে, ছবিতেও বাধা
এখন তোমার কাজ হল মা সকাল সন্ধ্যা কাঁদা।

ফিরব না আর বাড়িতে মা, মনে কর নাই
কি করে আর ফিরব বল ? পুড়ে আমি ছাই,
আমার প্রিয়জনকে বল রাগ করে না থাকতে
সত্যি যদি মনে পড়ে ! নতুন ছবি আঁকতে।

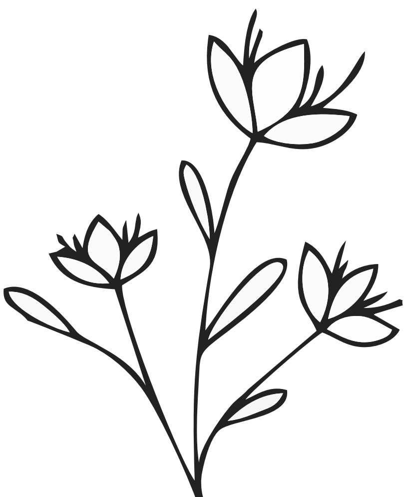

অবিন্যস্ত জীবনে

নিয়তি দাস

অবিন্যস্ত জীবনে স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন,
নিজের জায়গা দখল করে নিচ্ছে,
মানুষ আজকাল — বিচিত্র
জীবন জন্তুর রূপ ধারণ করে
গিলে ফেলছে মানবিকতা।
মাটির গন্ধও হারাচ্ছে বিশ্বাস,
তারপরও সময়ের দেয়ালে ফুটে শিউলি—
ক্রোধহীন শিউলিরা আবার
নিজের কথা না ভেবেই পড়ে ঝরে,
এই সেই শতচ্ছিদ্র সমাজ
যেখানে তুমি আমি
শব্দ ও শরীরের বৃত্তে ঘুরছি অহরহ।

প্রবন্ধ

বই, বইমেলা ও প্রকাশনা শিল্পের কিছু কথা

দেবানন্দ দাম

প্রকাশনাকে এখন শিল্প হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু একটা শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে তার কিছু বেসিক নিয়মকানুন আছে। যেমন, যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই ফ্যাক্টরি লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, জি এস টি রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বাধ্যতামূলক। কিন্তু একটা বই প্রকাশ করতে গেলে এখনও পর্যন্ত এইসব কিছু না হলেও চলে। আসলে বইকে কমোডিটি বা পণ্য হিসেবে এখনও গণ্য করা হয়নি। ফলে, নিয়মকানুনের এত কড়াকড়িও নেই। যার ফলে হয়তো প্রচুর আজে-বাজে বইয়ের প্রকাশনায়ও বাজার ছেয়ে গেছে। আজ আইনকানুনের কঠিন ও জটিল মারপ্যাঁচে না গিয়ে মূলত প্রকাশনা শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব।

সংবাদপত্র বাদ দিলে প্রকাশনা শিল্পকে মোটামুটিভাবে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, সৃজনশীল প্রকাশনা ও বিভিন্ন পাঠ্যক্রমভিত্তিক পড়াশুনোর বইপত্রের প্রকাশনা। সৃজনশীল প্রকাশনা বলতে আমরা সচরাচর গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি বই-কে বুঝি। আর পড়াশুনো সংক্রান্ত বইপত্রের প্রকাশনা হচ্ছে পাঠ্যবই এবং সেগুলির সহায়ক গাইড বা নোট বই।

এই শিল্পে যাঁরা প্রধান ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের পর-পর ধাপগুলো হল, প্রথমে --- লেখক বা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকারক, সম্পাদক, প্রধান সম্পাদক, কম্পিউটার অপারেটর, প্রুফ রিডার, শিল্প নির্দেশক, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পী, ফিল্ম বা ট্রেসিং আউটপুট,

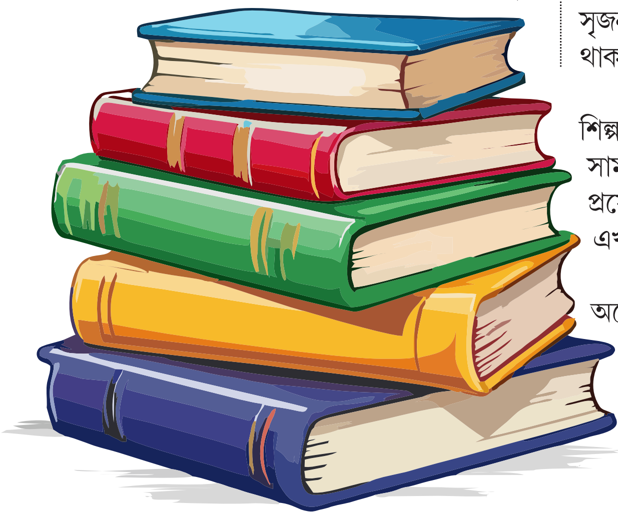

বড়ো কথা হল, চাইলে আপনিও গড়তে পারেন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তবে মনে রাখতে হবে, প্রকাশনা শিল্প পৃথিবীর তাবৎ অন্যান্য শিল্প থেকে একটু আলাদা। ভালো হয়, আপনার প্রিন্টিং টেকনোলজির একটা কোর্স করা থাকলে। এই শিল্পে আপনার আর্থিক দিকটি দৃঢ় করার পাশাপাশি দেশ ও সমাজের জন্য কিছু করার সুযোগও রয়েছে।

প্রোডাকশন, প্রিন্টিং, বাইন্ডিং, মার্কেটিং বা বিপণন। এই পুরো পর্যায়টিকে নিয়েই প্রকাশনা শিল্প। বর্তমানে আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তিতে আরও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

কেরিয়ার হিসেবে এই শিল্প এখন খুবই অভিজাত পর্যায়ের। এই শিল্পে কেরিয়ার গড়তে হলে প্রথমেই নির্বাচন করতে হবে, আপনি কোন বিভাগে কাজ করতে চান। আপনি যদি মেধাবী হন, তাহলে অবশ্যই একাডেমিক প্রকাশনার কাজ করতে পারেন। কিন্তু সৃজনশীল শাখায় কাজ করতে হলে মননশীল দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই।

সৃজনশীল শাখায় কাজের ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বই পড়া ও সামগ্রিকভাবে একটা উন্নত রুচিশীল মানসিকতা থাকা প্রয়োজন। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার প্রাথমিক যোগ্যতাটাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকাশনা শিল্পে কাজের ক্ষেত্রে রয়েছে আরও অনেকগুলো ধাপ। তবে সাধারণভাবে কাজ করতে গেলে প্রাথমিকভাবে তিনটি ধাপের কথা বলা হয়। এগুলো হল --- প্রি-প্রেস বা প্রি-প্রোডাকশন বা

প্রাক্ উৎপাদন পর্ব, প্রোডাকশন বা উৎপাদন, পোস্ট প্রেস বা পোস্ট প্রোডাকশন বা উৎপাদনের পর্ব। প্রথম পর্যায়ে লেখকের লেখা বা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, অনুবাদের কাজ থাকলে অনুবাদ করা, চিত্রশিল্পীর আলোকচিত্র বা ইলাস্ট্রেশান, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ, টাইপিং, প্রুফ রিডিং, সেটিং ইত্যাদি কাজগুলো হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে ফাইন্যানসিয়াল লায়াবিলিটিসের কথাও মাথায় রাখতে হবে। নিজে বিনিয়োগ না করতে পারলে ব্যাঙ্ক বা ফাইন্যানসিয়াল ইনস্টিটিউশনের সাহায্য নিতে হবে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রোডাকশন সেকশনে প্রোডাকশন ম্যানেজারের দায়িত্বে বই ছাপানোর বাকি কাজটুকু হয়। এই ক্ষেত্রে কাগজ কেনা, প্রেস নির্বাচন, ছাপার মান নিয়ন্ত্রণ, ছাপার পর বাইন্ডিং-য়ে পাঠানো ইত্যাদি। এই পর্যায়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পর পরবর্তী দায়িত্ব বর্তায় বিপণন বিভাগে। পোশাকি ভাষায়, যাকে বলা হয় মার্কেটিং। প্রকাশনার প্রসার বা পাঠক ক্রেতার হাতে সময়মতো বইটি পৌঁছানোর জন্য বিজ্ঞাপন, প্রয়োজনে লিফলেট বিতরণ, ব্রসিয়োর, ক্যাটালগ, ব্যানার, ফ্লাক্স ইত্যাদি তৈরি করে প্রচারের কাজটি মার্কেটিং সেকশনের দায়িত্ব।

বড়ো কথা হল, চাইলে আপনিও গড়তে পারেন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তবে মনে রাখতে হবে, প্রকাশনা শিল্প পৃথিবীর তাবৎ অন্যান্য শিল্প থেকে একটু আলাদা। ভালো হয়, আপনার প্রিন্টিং টেকনোলজির একটা কোর্স করা থাকলে। এই শিল্পে আপনার আর্থিক দিকটি দৃঢ় করার পাশাপাশি দেশ ও সমাজের জন্য কিছু করার সুযোগও রয়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়তে হলে আপনি আগেই সিদ্ধান্ত নিন, কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান আপনি গড়বেন। সৃজনশীল না কি একাডেমিক, না দুটোই। প্রকাশনা শিল্প কারখানা গড়ার জন্য আপনার থাকতে হবে অভিজ্ঞতা, সৃষ্টিশীলতা, সততা, পরিশ্রম করার মানসিকতা এবং অবশ্যই দক্ষতা এবং অফুরাণ ঝুঁকি। এটি একদিকে প্রতিযোগিতামূলক, আবার অন্যদিকে ভয়ানক জটিল কাজ। বই নির্বাচন, লেখক নির্বাচন এবং পাণ্ডুলিপি নির্বাচনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ভুল পাণ্ডুলিপি নির্বাচন হলে বিপদে পড়া অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান বাজার, সময়ের চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা রেখেই পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করতে হয়। সঠিকভাবে সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে কোয়ালিটি বই প্রকাশ করলে এবং অবশ্যই যথার্থ বিপণনের ব্যবস্থা করতে পারলে প্রকাশনা শিল্পে সাফল্য নিশ্চিত। অবশ্যই এক্ষেত্রে বইয়ের দাম নির্বাচনও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রোডাকশন খরচের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বইয়ের দাম নির্ধারণ করলে পাঠক-ক্রেতা অবশ্যই আপনার প্রকাশিত বইটি একবার নেড়ে চেড়ে দেখবেনই। মোটামুটি প্রোডাকশন ব্যয়ের তিন গুণ হিসেবে বইয়ের দাম ফেলতে হয়। কেননা, এর সঙ্গে বিপণন ও লেখকের রয়্যালটি-র ব্যাপারটি-ও রয়েছে। বর্তমানে প্রকাশিত বইয়ের বিপণন ও পাঠকের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে 'বইমেলা' একটি বিরাট এবং হয়তো বা বর্তমান সময়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একমাত্র বাজার। পাঠক তৈরির ক্ষেত্রে এবং পাঠক, লেখক ও প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান জায়গাই হল সারা দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়া এইসব বইমেলা। কিন্তু বর্তমানে প্রচন্ড প্রতিযোগিতার বাজারে, ই-বুকের দাপটে এবং গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সাইটের দৌলতে মুদ্রিত বইয়ের বাজার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। এক নিদারুণ অসম প্রতিযোগিতায় মুদ্রিত প্রকাশনা জগৎ আজ আতঙ্কিত।

আমরা আশায় দিন গুণছি পাঠককুল অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো আবার মুদ্রিত বইয়ের জগতে প্রবেশ করে, তাকে এক অনন্যমাত্রায় পৌঁছে দেবেন।

স্মৃতিকথা

একটি নাটক ও চন্দনদা

কার্তিক বণিক

ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে চন্দন চক্রবর্তী

মনে হয় সেদিনের কথা। আসলে কথাটি আজ থেকে আনুমানিক ৩৫ বছর আগের। ক্লাবে আমাদের সবাইকে ডাকা হলো। সবাই মানে আমরা যারা ক্লাবের নাট্য বিভাগের সাথে জড়িত। পিন্টুদা, শংকরদা, রতনদা, চন্দনদা, স্বপনদা... আর কারোর নাম মনে আসছে না। ও হ্যাঁ, যে কথাটা বলা হলো না, সেটা হলো এই ক্লাবের একটি নাট্য চর্চার বিভাগ আছে। আমরা সবাই সেই পরিবারের সদস্য। সবাই বসার পর ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হলো খোয়াই শহরে আমাদের নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কোন্ নাটক করা হবে--- তা স্থির করতেই আমাদের কালঘাম ছুটে গেল। কারণ, আমাদের কাছে কোনো নাটকই প্রস্তুত ছিল না। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গেলে একটি উন্নত গুণমানসম্পন্ন নাটক চাই। তাই নানাজনে নানা প্রস্তাব দিচ্ছেন। কিন্তু কোনোটাই আমাদের মনোমত হচ্ছিল না। তখন ডাক পড়লো আমাদের চন্দনদার অর্থাৎ ক্লাব সদস্য চন্দন চক্রবর্তীর। সেই চন্দনদাকে নিয়েই এই কাহিনী।

শহর দক্ষিণাঞ্চলে সম্ভবত এটাই একমাত্র ক্লাব, যারা নিজস্ব নাট্য সংস্থা গড়ে নাট্যচর্চা করতো। বলছি মডার্ণ ক্লাবের কথা। এই ক্লাবের নাট্য চর্চা কেন্দ্রের নাম ছিল 'প্রতিবিম্ব নাট্য সংস্থা'। সেসব গত শতাব্দীর আটের দশকের কথা। আমরা কয়েকজন নাট্যকর্মী ক্লাবের পক্ষে প্রতিবিম্ব নাট্য সংস্থার হয়ে নাটক করছি। আমি খুব সম্ভবত এই ক্লাবে ও নাট্য কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম ১৯৮৫-৮৬ সালে। 'প্রতিবিম্ব'র হয়ে আমরা প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতাম। বিশেষ করে নাটকের প্রাণকেন্দ্র খোয়াই শহরে প্রতিবছর প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া হতো নিয়মিতভাবে।

১৯৮৮ সাল। সেবার আবার খোয়াই শহরে নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ডাক আসে। কিন্তু হাতে কোনো নতুন নাটক নেই। তাই বলে এই ঐতিহ্যবাহী মডার্ণ ক্লাব অংশ নেবে না? সেইদিন ওই সভায় বসে দায়িত্ব পড়লো চন্দনদার ওপর। একটিমাত্র নাটক আছে যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, সময়োপযোগী এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার মতো। কথাটি বললেন, আমাদের সজলদা মানে সজল চক্রবর্তী। খুব সম্ভবত তিনি তখন ছিলেন ক্লাব সম্পাদক। বর্তমানে ক্লাব সভাপতি। এই সজলদাকে যারা চেনেন তারা জানেন, যে তিনি যেকোনো সমস্যারই সমাধানে ওস্তাদ। কিন্তু তিনি অভিনয় করেন না। সেদিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমরা করবো রতন কুমার দাসের রচিত 'অভিযাত্রী একটি নাট্য সংস্থা' নামে নাটকটি। অনেক আগে আমরা ক্লাবের হয়ে এই নাটকটি করেছিলাম। খুব ভালো নাটক। এই নাটকের অভিনেতারাও প্রায় সবাই উপস্থিত তখন। কিন্তু স্ক্রিপ্ট কোথায়? এই স্ক্রিপ্টের কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না। একমাত্র মুশকিল আসান চন্দনদা। যিনি এই পুরো নাটকটির পূর্বাপর সংলাপ তখনও প্রায় মুখস্থ রেখেছেন। তাই দায়িত্ব নিয়ে ময়দানে নেমে পড়লেন চন্দনদা। তিনি নিজের স্মৃতি আর শ্রুতিকে কাজে লাগিয়ে স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে লেগে গেলেন। দু'দিন পর থেকেই নাটকের রিহার্সাল শুরু করতে হবে। পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হলো রাজ্যের বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক স্বপন ভট্টাচার্যকে।

একদিকে, এগিয়ে চললো স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ। সাথে শুরু হয়ে গেল রিহার্সাল। ক্লাবের সদস্যরাই অভিনেতা। শুধু একজন অভিনেত্রীকে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে আহ্বান জানানো হলো। পূর্ণ উদ্যোমে চলতে লাগলো রিহার্সাল। যত বাধা এলো ঠুনকোর মতো সব উড়ে গেল। প্রস্তুতি চূড়ান্ত।

নির্ধারিত দিনে অভিনেতা অভিনেত্রী সবাই মিলে চললাম নাটকের শহরে। সবশেষে মডার্ণ ক্লাবের হয়ে আমরা খোয়াই শহরে নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। দিনটি ছিল ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ সাল। খোয়াই টাউন হলে মডার্ণ ক্লাবের নাট্যচর্চা কেন্দ্র প্রতিবিম্ব নাট্য সংস্থা মঞ্চস্থ করে রতন কুমার দাস রচিত 'অভিযাত্রী একটি নাট্য সংস্থা' নাটকটি।

সেবার এই নাটক মঞ্চস্থ করে একাধিক পুরস্কার জিতে নিয়েছিল এই সংস্থা। সেদিনের সেই অসাধারণ স্মৃতিধর চন্দন চক্রবর্তী ও নাট্যনির্দেশক স্বপন ভট্টাচার্য দু'জনই আজ প্রয়াত। বিখ্যাত এই দু'জনকে কিছুতেই ভুলা যাবে না। এমন প্রখর স্মৃতিসম্পন্ন মানুষ আজ আর খোঁজে পাবো না। তাঁদের মনে রাখা আমাদের কর্তব্য এবং তাঁদের কাজগুলো রপ্ত করাও আমাদের দায়িত্ব। অভিনয় একটি অত্যন্ত শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম। যা উপলব্ধি করেছিলেন চন্দন চক্রবর্তী। মডার্ণ ক্লাবের শারদীয়া স্মরণিকার নামও 'প্রতিবিম্ব'। এই প্রতিবিম্বের নিঃসৃত আলোক রশ্মিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকুক প্রতিবিম্ব নাট্য সংস্থা ও মডার্ণ ক্লাব।

শহর দক্ষিণাঞ্চলে সম্ভবত এটাই একমাত্র ক্লাব, যারা নিজস্ব নাট্য সংস্থা গড়ে নাট্যচর্চা করতো। বলছি মডার্ণ ক্লাবের কথা। এই ক্লাবের নাট্য চর্চা কেন্দ্রের নাম ছিল 'প্রতিবিম্ব নাট্য সংস্থা'। সেসব গত শতাব্দীর আটের দশকের কথা।

গল্প

বু

অগ্রতা দেব

নামটা খুব ভেবেচিন্তেই রাখা হয়েছিলো। কিন্তু কে জানতো এনিয়ে এতো হাঙ্গামা বেঁধে যাবে।

'চূড়ান্ত অপমান করলি তাথৈ! চূড়ান্ত অপমান! এটা মনে থাকব। আর তোদের বাড়িতে পা রাখুম না।'

তাথৈ অবাক। শান্তা পিসির এতোটা উত্তেজিত হয়ে উঠার প্রয়োজন ছিলো না। মাঝেমধ্যেই পিসি আসেন। এবার এলেন বছরখানেক পর। আত্মীয়তা নেই। তাথৈদের পুরনো পাড়ার প্রতিবেশী। বয়স ষাট পেরিয়ে গেলেও শান্তা পিসি পাড়ার ছেলেবুড়ো সবারই পিসি। প্রতিবেশীরা পিসিকে মুখরা হিসাবেই জানেন। পানক সাপের সাথে তুলনা করেন অনেকে। কিছু হলেই ফোঁস করে উঠাই পিসির স্বভাব। তাথৈরা নতুন পাড়ায় চলে এলেও পিসির যাতায়াত ছিলো। খোশগল্প করতে ভালোবাসেন। মূল উদ্দেশ্য পুরনো কাপড় নেয়া। পিসি আসবেন ধরে নিয়ে তাথৈর মাও যত্ন করে পুরনো কাপড় তুলে রাখেন।

এবার এলেন পুত্রবধূকে নিয়ে। আর এখানেই পাকিয়ে গেলো জট। গেটে ধাক্কা দিয়েই শান্তা পিসি ডাক ছাড়লেন--- 'কি গো তাথৈর মা... বাড়ি আছনি? ...ও গো তাথৈর মা...'

তাথৈর আজ ক্লাস নাইনের প্রথম দিন। এই প্রথম সালোয়ার কামিজ পরে স্কুলে যাবে। আনন্দে তাতা... থৈথৈ... অবস্থা তাথৈর। মেয়ের জন্য ভালো খাবার তৈরিতে ব্যস্ত মা। কাজের ফাঁকে বাবা এসে স্কুলে নিয়ে যাবেন। এর আগে বাবার অভ্যেস মতো নতুন সালোয়ার কামিজে একটা ফটোসেশন তো হবেই। সব মিলিয়ে ছোট্ট পরিবারে তখন চরম ব্যস্ততা।

শান্তা পিসির গলার শব্দ পেয়ে তাথৈর মা বললেন--- 'আরে পিসি যে! অনেকদিন পর! আসো... আসো...'

চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বারান্দায় বেরিয়ে এলো তাথৈ। রান্নাঘর থেকে মা বললেন--- 'তাথৈ বু-কে ঘরে নিয়ে আয়।'

তাথৈর মার মুখে 'বু' শুনে পিসি খুব খুশি। ছেলের বৌকে হাতের কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে পিসি বললেন--- 'দেখলি বৌমা, তাথৈর মা কত চালাক। তাথৈর মার যে ভাল বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তরে তো আগেই কইছি।'

শান্তা পিসির বৌমার বড় করে ঘোমটা দেয়া। ঘোমটার আড়ালে কপালের সিঁদুর দেখা যাচ্ছে না। নাকে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো পড়ে থাকা সিঁদুর অবশ্য দেখা যাচ্ছে।

বৌমাকে নিয়ে সোজা বারান্দায় এসে উঠলেন পিসি। 'কর্ কর্ প্রণাম কর্' ---বলে ছেলের বৌকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে তাথৈর মার পায়ের কাছে পৌঁছে দিলেন। মুখে প্রসন্নতার ছাপ ধরে রেখেই তাথৈর মাকে পিসি জিজ্ঞেস করলেন --- 'তুমি আমার বৌমার নাম আগেই জানতে বুঝি?'

কড়াইয়ে পাঁচফোড়নের সম্ভার দিতে দিতে তাথৈর মা জানালেন--- 'না না, আমি তোমার ছেলের বৌয়ের নাম জানি না। নাম তো দূরের কথা, তোমার ছেলের যে বিয়ে হয়েছে তাই তো জানি না। কি নাম তোমার বৌমার?'

মুখের প্রসন্ন ভাব কিছুটা মিলিয়ে গেছে। কাপড়চোপড় পান বলে বৌমার কাছে তাথৈর মার ভুরিভুরি প্রশংসা করে এসেছেন শান্তা পিসি। না চাইতেই তাথৈর মা কতোকিছু যে দেয় তাও ছেলের বৌয়ের কাছে বড়াই করে বলে রেখেছেন।

'তুমি জান না? না জেনে কি করে তাথৈকে বললে বু-কে ঘরে নিয়ে আসতে? বু তো আমার বৌমার নাম।'

পিসির কথা শুনে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাবার অবস্থা মা ও মেয়ের। তাথৈর মা হাসি চাপা দিয়ে বললেন--- 'আরে এটা তো আমাদের কুকুরের নাম।'

পিসির মুখে প্রসন্নতা আর ছিঁটেফোটাও নেই। রাগত স্বরে পিসি বললেন--- 'কি বললে!?'

পাশ থেকে তাথৈ বললো--- 'বু আমাদের ডগির নাম।'

শুনেই পানক সাপ ফোঁস করে উঠলো।

'একদম বানিয়ে কথা বলবে না। জেনে বুঝেই আমার

বৌয়ের নামে কুত্তার নাম রেখেছ তোমরা। যখনই আসি কিছু না কিছু বলে তোমার জামাই ক্ষেপায়। আমারে ক্ষেপায় তাও কিছু মনে করি না। তাই বলে আমার বৌমাকে নিয়া ফাইজলামি!'

পিসি একদম ক্ষেপে লাল। পিসিকে ঠাণ্ডা করার জন্য তাথৈর মা বললেন--- 'আরে কুকুরের এই নামটা তো একেবারে স্বতন্ত্র। কোনো মানুষের নামের সাথেই এর টাচ্ হওয়ার কথা না। অনেক ভেবেই তাথৈ কুকুরটার নাম বু রেখেছে।'

শান্তা পিসির রাগ গিয়ে পড়ে তাথৈর উপর। 'কিরে তাথৈ, তুই এই নাম কই পেলি?' ---চোখ বড়ো করে জানতে চান পিসি।

থতমত খেয়ে যায় তাথৈ। বলে--- 'এটা ফরাসি শব্দ। কুকুরটা আনার পর মা-বাবা বলেছিলেন এর এমন নাম রাখতে যেন মানুষের নামের সাথে কিছুতেই মিলে না যায়। বু-র ইংরেজি বানান BEAU। এর বাংলা অর্থ সুন্দর।'

'আমারে ফরাসি শিখান লাগত না। আমি সব বুঝি। ঐ পাড়া থেকে আমার বৌমার নাম জেনে এই নামে তোমরা কুত্তার নাম রাখছ।'

তাথৈর মা যতই বলেন--- 'না.. না.. এমন না', পিসি ততই বলেন--- 'তোমরা জেনেবুঝেই এটা করছ।'

এদিকে পিসির বৌমার এতে তাপ উত্তাপ কিছুই নেই। কুকুরটাকে নিয়ে খেলা করছে বৌমা। দুই 'বু' মিলে সাংঘাতিক ভাব জমে উঠেছে।

তাথৈর মা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন। বলেন--- 'পাঁচ মাস বয়স কুকুরটার। জন্মের পরপরই নাম রাখা হয়েছে। তখন তো নিশ্চয় তোমার ঘরে বৌ আসেনি?' পিসির ক্ষেপ কমাতে তাথৈর মার এই যুক্তিও ব্যর্থ। আবারও ফোঁস করে উঠেন পিসি।

'আমার সন্দেহই ঠিক। তোমরা কুত্তার নাম রাখছ পাঁচ মাস আগে। আমার ছেলের বিয়ে হয়েছে ছয় মাস হল। আর কি বুঝতে বাকি আছে? ঐ পাড়া থেকেই তোমাদের কাছে আমার বৌমার নাম সাপ্লাই হয়েছে। সবটাই প্ল্যান করে করছ। আমারে ক্ষেপাতে।' ---গজগজ করে বলতে থাকেন পিসি।

বেলা বাড়তে সূর্যও উত্তাপ বাড়াতে শুরু করেছে। এরসাথে রান্নাঘরে গ্যাসের চুলার গরম। শান্তা পিসির এমন কথাবার্তায় মেজাজ চড়ছে তাথৈর মারও। তবুও ধৈর্য্য ধরে আছেন। পিসির রাগ কমাতে দুটো শাড়ি প্যাকেট করে এনে রেখেছেন বারান্দায়। চোখ ঘুরিয়ে শাড়ির প্যাকেট দেখলেন পিসি।

তাথৈর মা বললেন--- 'তোমাকে ক্ষেপিয়ে আমাদের কি লাভ? তাছাড়া এতো নাম থাকতে তোমার বৌমার নাম বু-ই বা কেন?'

শাড়ির প্যাকেটে মেজাজে একটু হেরফের হয়েছে পিসির। এরমধ্যে তাথৈ দুই গ্লাস ঠান্ড জলও এনে দিয়েছে। বৌমার নাম যে আসলে 'বুলবুলি' জলের ঢোঁক গিলে জানালেন পিসি। বিয়ের পর আদর করে বুলবুলি থেকে সটকার্টে বু করার কথাও জানালেন। রেগার কাজে যেতে হবে বলে এনিয়ে আর কথা যে বাড়ালেন না তাও শুনিয়ে দিয়েছেন পিসি।

অন্তরে যাই হোক, বাইরে পানক সাপের খোলসটাই ধরে আছেন শান্তা পিসি। খপ করে ব্যাগে পুরে নিলেন শাড়ির প্যাকেটটা। বৌমার হাত ধরে টানতে টানতে বললেন--- 'চল্ চল্ আর থাকতে হবে না। অনেক অপমান হয়েছে। এই বাড়িতে আর পা রাখুম না।'

বু-র কোলে ততক্ষণে বু উঠে বসে আছে।

'এসব কথাবার্তা ছাড়েন মা। কুত্তাটা তো আমার থেকেও কিউট।' ---সারমেয়কে আদরে ভরিয়ে দিয়ে বললেন বৌমা বু।

'তোর লাজলজ্জা ঘেন্না সরম কিচ্ছু নাই।' ---জোর করে বৌমাকে ধরে বারান্দা থেকে উঠানে নামতে নামতে বলেন শান্তা পিসি।

'নববর্ষে আরও দুটি শাড়ি রাখবো।' ---রান্নাঘর থেকে হাঁকান তাথৈর মা। মুখ বেজার করে বৌমার হাত ধরে হনহন করে বেরিয়ে যান পিসি। পেছন পেছন লেজ নাড়িয়ে ছুটছে চার পায়ের বু-ও। গেট ঠেলে দ্রুত বাড়িতে ঢুকতেই উঠানে শান্তা পিসির সাথে চোখাচোখি হয় তাথৈর বাবার।

'তাথৈ বু-কে ঘরে নিয়ে যা' ---চিৎকার দিয়ে বলেন বাবা।

বৌমাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে হ্যাঁচকা টানে গেট খোলেন পিসি। নববর্ষে শাড়ির আমন্ত্রণে মেজাজ কন্ট্রোল হওয়ার আগেই তাথৈর বাবার মুখে আবার 'বু' শুনে পিত্তি জ্বলে উঠে পিসির। তাথৈর বাবা কথা বলতে এগিয়ে আসতেই পিসি মুখ ঝামটা দিয়ে বৌমাকে শুনিয়ে বলেন--- 'কইছিলাম না, এটা এই শয়তানটারই কাজ।'

স্মৃতিকথা

সন্তান হারা বাবা-মা'র দুর্গা পুজোর অনুভূতি

মঞ্জুরী ভট্টাচার্য (কর)

চারিদিকে আগমনীর সুর। শুভ্রনীল আকাশে কাশফুলের দোলায় বার্তা দেয় মা আসছেন। এই সময় ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবাই আনন্দে মেতে উঠে। শারদ উৎসব বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব।

মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের মনমুগ্ধকর চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে বাঙালির শারদোৎসবের সূচনা। আগে রেডিওতে মহালয়া শুনে মনে হতো সত্যি পুজো এসে গেছে।

আমার ছোট্ট মৌ পুজোর প্রায় মাস খানেক আগে থেকেই রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলত মা, 'প্রতীক্ষায় ৩০ দিন'। পরের দিন বলত মা, 'প্রতীক্ষা ২৯ দিন'। তখন টিভিতে 'ই-টিভি বাংলা' বলে একটা চ্যানেল ছিলো, যেখানে পুজোর প্রায় দু'মাস আগে থেকেই দেখাত প্রতীক্ষার ৬০ দিন, ৫৯ দিন, ৫৮ দিন... এরকম। আর ছোট্ট মৌ সেটা দেখেই খুশি হয়ে মাকে বলত--- 'তাড়াতাড়ি পড়াশুনা সেরে পুজোর জামা কিনতে যাবো। এনিয়ে তার যে কতো প্রশ্ন থাকতো। কেনাকাটার ব্যাপারে মায়ের চেয়ে বাবাকে বেশি ভরসা করতো। বাবাও তার রাজকন্যাকে মনের মত করে সাজানোর জন্য পোশাকের সাথে মিলিয়ে চুরি, মালা, হেয়ারব্যান আরও কত কিছু সাধ্যমত কিনে দেওয়ার চেষ্টা করতো।

আমার মৌ

মহালয়ার দিন ভোরবেলা যখন টিভিতে মহিষাসুরমর্দিনী শুরু হতো, তখন মৌ সবার আগে ঘুম থেকে উঠে মহালয়া দেখতো। পুজো এসে গেছে বলে তার যে কতো আনন্দ। বলতো--- 'আর মাত্র ক'দিন।'

এভাবে বছরে পর বছর কাটতে কাটতে মৌ বড় হয়ে উঠল। সফলতার সঙ্গে জীবনের প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছল। বাবা-মা হিসেবে আনন্দে আমাদের বুকটা ভরে উঠল। একটু নিশ্চিত হলাম। ভাবলাম আর মাত্র তিন-চারটে বছর, তারপর সে নিজেকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলবে। একজন সাকসেসফুল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় আমাদের মৌ আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেল। আমাদের জীবন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। বাঁচার শক্তি হারিয়ে ফেললাম।

পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যাওয়ার শক্তি থাকলেও সন্তান হারানো ব্যথা ভোলার মত শক্তি বাবা-মা'র থাকে না। হয়তো বা দশজনের সামনে ওরা ভাল থাকার অভিনয় করে, কিন্তু মোটেই ভাল নেই। সভ্যতার অভিধানে খামতি শুধু এই, মা-বাবার কান্নার কোনো প্রতিশব্দ নেই।

এখন কোনো আনন্দ অনুষ্ঠান এলেও মনে কোনো আনন্দ হয় না। পূজা এলে বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠে। মনে হয় আজ আমার মৌ বেঁচে থাকল কতো আনন্দ করত। মহালয়ার সুর বাজলে বুকটা হাহাকার করে উঠে। পুজোর বাজনা, আলোকসজ্জা দেখলে চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। মনে হয় ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই। তবুও সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। পুজোর সময় আমাদেরকেও বেরুতে হয় পুজো দেখতে, আমাদের ছোট সন্তানটির কথা ভেবে। কিন্তু মনে থাকে না কোনো আনন্দ। শুধু দুঃখে বুকটা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। মনে হয় যেন আমার মৌ আমাকে কেঁদে বলছে, 'মা, তোমরা আমাকে ছাড়া কিভাবে পুজো দেখতে বেরিয়েছো? আমার কথা কি তোমাদের একটুকুও মনে পড়ে না?' আর আমার বলতে ইচ্ছে করে, 'না-রে মা, তোকে একটুও ভুলিনি, সন্তান হারানোর যন্ত্রণা বাবা-মা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভুলতে পারে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে তুই জড়িয়ে আছিস। এই শহরের প্রতিটি জায়গায় তোর স্মৃতি আমাদেরকে খুব কষ্ট দেয় মা। কিন্তু কি করবো বাস্তবের কাছে আমরা যে অসহায়।

সবশেষে, জগৎজননী মাকে বলতে ইচ্ছে করে মাগো তুমি তো জগতের মা। তাহলে তুমি কেন মায়ের কোল খালি করে নিয়ে যাও। আর যেন কোন বাবা-মায়ের অকালে তাদের সন্তানকে হারাতে না হয়।

আলোচনা

ওস্তাদ শব্দটাই যেন প্রেমময়

নির্মল অধিকারী

ওস্তাদ শব্দটা প্রধানতঃ ফার্সি শব্দ। এর অর্থ গুরু বা শিক্ষক। মালিক বলতেও এ শব্দটা ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটা এশিয়ার মুসলিমদের মধ্যে বহুল প্রচলিত এবং এর অর্থ যাকে বুঝায়, তিনি খুব সম্মানজনক এবং শ্রদ্ধার। ফরাসি ভাষা থেকে এ শব্দটা বাংলা এবং আরো অন্যান্য ভাষায়ও বহুল প্রচলিত। শব্দটাতে একটা তেজ আছে। এর মধ্যে একটা আপনত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথ ওস্তাদ শব্দটি ব্যবহার না করলেও, যাকে তিনি প্রভু বলেছেন, এ 'প্রভু' শব্দটির সঙ্গে ওস্তাদের একটা সম্পর্ক আছে। যেমন তিনি লিখলেন --- প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি। / এসেছি তোমারে, হে নাথ, পরাতে রাখী। ওস্তাদকেও সবাই, এভাবে মনে রাখে। শ্রদ্ধা জানায়।

একটা বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে, 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে।' এটা একটা আবেগের কথা। এর মধ্যে দম আছে। ওস্তাদরা তাই খুব বেশি পরিমাণে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পায়। ইদানিং, ' শিক্ষক' কথাটার সঙ্গে আবেগের যে বিচ্ছেদ হয়েছে, সাধারণত ওস্তাদের সঙ্গে ওটা হয় না। এ এক নিবিড় আলোচনার বিষয়।

একটা বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে, 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে।' এটা একটা আবেগের কথা। এর মধ্যে দম আছে। ওস্তাদরা তাই খুব বেশি পরিমাণে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পায়। ইদানিং, 'শিক্ষক' কথাটার সঙ্গে আবেগের যে বিচ্ছেদ হয়েছে, সাধারণত ওস্তাদের সঙ্গে ওটা হয় না। এ এক নিবিড় আলোচনার বিষয়।

কতকগুলি ঘটনা আমাদেরকে ওস্তাদ এবং তার স্ট্যাটাস চিনতে সাহায্য করে। ওস্তাদ কোথাও কোথাও আবার আচার্য হিসেবেও পরিচিতি পায়। যদিও, কাজের দিক দিয়ে ওস্তাদ শিক্ষাদানকারী গুরু হিসেবে পরিচিত।

ঘটনা এক : আমার সহধর্মিনী আমাদের গাড়ির চালক থেকে ড্রাইভিং শিখেছে। গাড়ির চালক শেখানোর আগে তার ওস্তাদকে স্মরণ করে নিজেও নিজেকে ওস্তাদ বলে ঘোষণা করে। গাড়ি শেখার পর সহধর্মিনী ওই চালককে আজও ওস্তাদ হিসেবে মেনে চলে। এ যেন একটা পরম্পরা। এটাকে ঐতিহ্যও বলা যায়।

ঘটনা দুই : আমি এক সরকারি কাজে নিযুক্ত গাড়ির চালককে তার ওস্তাদের জন্মদিন পালন করতে দেখেছি। এতটাই শ্রদ্ধা, ওস্তাদের প্রতি ঐ গাড়ির চালকের, অবাক হতে হয়। এ যেন--- নত হয়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে। /নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।। (রবীন্দ্রনাথ)

ঘটনা তিন : বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্কলাররা যে শিক্ষকদের সঙ্গে গবেষণা করেন, তাদেরকে গাইড বলা হয়। এরাও ওস্তাদ এবং এদের সম্মান-শ্রদ্ধা ওস্তাদ থেকে কম হয় না। ছাত্র-ছাত্রীরা আজীবন ঐ গাইডদের মনে রাখেন। জন্মদিন পালন, পুজোর উপহার কিছুই বাদ যায় না। শিক্ষকদের এ এক আনন্দের বিষয়।

ঘটনা চার : প্রতি বছর ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবস পালন ভারতবর্ষে একটা বহুল প্রচলিত ঘটনা। যদিও বর্তমান সময়ে এ দিবস পালনের গুরুত্ব ধীরে ধীরে কিছুটা হলেও স্তিমিত। সবকিছুর মধ্যেও শিক্ষকরা, ওস্তাদরা এই যে সম্মান পাচ্ছেন, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ঘটনা পাঁচ : একলব্য আর তার ওস্তাদ দ্রোণাচার্যকে কে না চিনে! একলব্যের ত্যাগ এবং ভক্তি, ওস্তাদের প্রতি শিষ্যের আত্মসমর্পণের এক অনন্য উদাহরণ।

ঘটনা ছয়: ইদানিং বিভিন্ন সংগঠন বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক ঘরানায় আচার্য পরম্পরা দেখা যায়। এটাও ওস্তাদ মেনে চলারই বহিঃপ্রকাশ।

ঘটনা সাত : শিবাজী মহারাজ তার গুরু রামদাসের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাবান, ভক্তিমান ছিলেন, তা সবারই জানা। গুরু রামদাস শিবাজীর ওপর রাজ্য চালানোর ভার দিলেন এবং শিবাজী তার প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্য চালাতেন। ওস্তাদ মেনে ওস্তাদকে সামনে রেখে চলা, যথেষ্ট নিরাপদ এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এটা শিষ্যকে ভালোভাবে, মসৃণতার সঙ্গে পথ চলতে সাহায্য করে।

ঘটনা আট : আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে যে উপনয়ন বিধি আছে, তা শিষ্যকে গুরুর সঙ্গে যুক্ত করে। ঐখানেও ওস্তাদেরই জয়।

ইদানিং লক্ষ্য করার মত একটা ব্যাপার, ওস্তাদ বা তার জয় যতটাই চোখে আনন্দ জাগায়, তথাকথিত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সেটা যেন কিছুটা ম্রিয়মাণ। বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন নেশায় যুক্ত এই ওস্তাদ এবং তার শিষ্যরা অনেক সময় তথাকথিত শিক্ষার আলোক থেকে অনেক দূরে থাকেন। তবুও তাদের শ্রদ্ধার কোন ঘাটতি হয় না।

এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। অথচ বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত যারা শিক্ষিত হন, তাদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা মূল্য দিয়ে চিন্তা করার সময় এখন এসেছে। কোথায় যেন একটা হারিয়ে যাওয়া, না পাওয়া বা বঞ্চিত হওয়ার সুর লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক-ছাত্র বা ওস্তাদ-শিষ্যের এ যে মহিমান্বিত সম্পর্ক, তা শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কেন বেসুরু, গৌরবান্বিত শিক্ষকরাই এর উত্তর দিতে সক্ষম।

শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে সদগুরু বলেছেন--- শ্রদ্ধাই জ্ঞানকে সার্থক-সঙ্গত করে তুলতে পারে - সুসংহিত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে। ..... শ্রদ্ধাই জ্ঞানের ভূমি। (শিক্ষা বিধায়না)। শিক্ষকরা যেহেতু গাইড বা আদর্শ, তাই তাদেরকে একটা আদর্শ ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা খুব জরুরি। শিক্ষাক্ষেত্রে এটা সম্ভব হচ্ছে না এবং শিক্ষাটা, বিশেষ করে শিক্ষাদান পদ্ধতিটা এমনি গুলমেলে যে ওতে আদর্শচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জায়গায় ওস্তাদ জয়ী হয়েছেন কারণ ওখানে শুধুমাত্রই আদর্শভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি থাকে। নেই কোন সময়সীমা, নেই কোন পরীক্ষা, আছে শুধু আন্তরিকভাবে উদ্বর্ধন করানোর কৌশল। দেখতে গেলে বহু উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সংগীত, চিত্রকলা, তবলা, খেলাধুলা বা আরো কতগুলি ভোকেশ্যনাল শিক্ষা আমরা যাকে বলি, ওই জায়গায় শিক্ষক বা ওস্তাদদের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের বা শিষ্যদের টান বা শ্রদ্ধা, তা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেন ? ওইটার উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়, যা অতি বাস্তব। বর্তমান সময়ে শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। আর্থিক সম্পর্ক বা বিভিন্ন নীতির পার্থক্যজনিত কারণে এমনটা দেখা যাচ্ছে। ওটা হবার নয়। শ্রীশ্রী গীতায় আমরা পাই, ---অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। (চতুর্থ অধ্যায় /৪০ নং শ্লোক)। এর অর্থ অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। শ্রদ্ধা দ্বারা যেহেতু জ্ঞানলাভ হয়, তাই বিশ্বাস ছাড়া সংশয় থাকলে প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব নয়। ওস্তাদের প্রতি শিষ্যদের সেই বিশ্বাস থাকে। সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। তাই জ্ঞান লাভ প্রকৃত মর্যাদা পায়।

আজকালকার দিনে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালনের কোন নির্দেশ থাকেনা। শিক্ষকদের প্রকৃতপক্ষে শিষ্যদেরকে সমাবর্তন করে কিছু জ্ঞান দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য। ওটা ওস্তাদগণ করতে পারেন, কারণ তাদের সঙ্গে পেশাগত বা আর্থিক কোন সম্বন্ধ শিষ্যদের থাকে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আমরা পাই, গুরু তার শিষ্যদের শিক্ষান্তে সত্য কথা বলা এবং ভালো কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ করার উপদেশ দিতেন। আজকাল পুঁথিগত শিক্ষায় ওইটা প্রায় বিলুপ্ত। কিন্তু ওস্তাদের ঘরানায় সেটা পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা পাই-শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি। (৫/২/৩)। অর্থাৎ দমন কর, দান কর এবং দয়া কর --- এই শিক্ষা নিতে হবে। এই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এখনকার সুকল কলেজে এই শিক্ষা দেওয়া হয় না বললেই চলে।

তবে ওস্তাদের ঘরানায় এ ধরনের শিক্ষা খুব স্বাভাবিক। তাই চারিদিকে ওস্তাদের জয় জয়কার ঘোষণা হয়।

ওস্তাদ বিসমিল্লাহখান, রশিদখান বা ক্রিকেট কোচ দেশপ্রেম আজাদ এখনো ওস্তাদ শব্দটাকে সম্মান দিয়ে চলেছেন। শিক্ষক কথাটাতেও বহু ক্ষেত্রেই এখনো সম্মান - শ্রদ্ধা যুক্ত হয়। তবে এই আলোচনার প্রথম থেকে এটাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে ওস্তাদ শব্দটাতে যে পরিমাণ সম্মান প্রযুক্ত হয়, আজকাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে সেটা যেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু ধূসর হয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কালের কোন এক নিয়মে কিছু কিছু অভ্যাস-ব্যবহার যেন লুপ্তপ্রায়। ওটা কাম্য নয়। তাই শিক্ষকদের যেমন প্রেমময় ওস্তাদ হওয়ার প্রয়োজন আছে, প্রতি মুহূর্তে নিজেদেরকে আরো থেকে আরোতর প্রকৃত জ্ঞানী করার পথে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। এ অভ্যাস ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও ছড়িয়ে যাবে। যারা ওস্তাদ নামে পরিচিত, রেওয়াজ বা প্র্যাক্টিস ছাড়া শিক্ষাদান তাদের কাছে একদমই চলে না। এমনি করে উনারা নিজেদেরকে গড়ে তোলেন। তাই এতোটা সম্মান। রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই এই গুরু বা শিক্ষক বা ওস্তাদদের উদ্দেশ্যে তাই গাইলেন, ---আমি তোমারও সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে ---/ তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।। এই অজানা সাধনায় পাওয়ার মন্ত্রে শিষ্যরা, ওস্তাদগণকে প্রেমময় করে তুলেছেন। ওখানে আছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তাই শেষ চরণে বলা যায়, 'যে পঙ্কে ওই চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

আলোচনা

দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে

প্রণয় কুমার রায় বর্মণ

কথায় বলে Necessity is the mother of invention. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য মানব কুলের চাওয়া পাওয়ার প্রচেষ্টার অন্ত নেই। নিত্য নতুন আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ তার অভাব পূরণে ব্যস্ত। এই অভাব পূরণের জন্য আমরা অতিমাত্রায় যন্ত্র শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এই যন্ত্র নির্ভরতা আমাদের অভাব মোচনে সহায়তা করছে ঠিকই, কিন্তু এর দ্বারা আমরা ভাবী অমঙ্গলকে সাদরে বরণ করে আসছি। অভাবের তাড়নায় এবং আবিষ্কারের উন্মাদনায় আমরা যন্ত্র সভ্যতার কুফল সম্পর্কে অধিক মনোযোগ দিই না। অবশ্য এ সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা শুরু হয় অনেক পরে। বিজ্ঞান সবসময়ই সুদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে এগিয়ে চলছে।

প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দানে মানুষ আজ তৃপ্ত নয়। তাই প্রকৃতির উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালিয়ে মানুষ তার প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহের মারণ যজ্ঞে লিপ্ত। বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আমরা প্রকৃতির প্রধান সম্পদ বড় বড় গাছপালা এবং অরণ্য ধ্বংস করে কলকারখানা স্থাপন করেছি। কৃষি জমি এবং পতিত জমিকে কৃষিযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত করে দোফসলী ও তিনফসলী চাষে লিপ্ত হয়েছি। এই কর্মকান্ডের ফলে আমরা যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ সৃষ্টি করেছি। জীবজন্তুর মলমূত্র থেকে, পচ্য নর্দমা থেকে এবং বিভিন্ন কীটনাশক ওষুধপত্র থেকে কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার থেকে প্রতিনিয়ত নির্গত হচ্ছে নানা ধরনের বিষাক্ত গ্যাস। যেমন, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, আর্সেনিক, বিসমাথ, কার্বন, লেড প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষাক্ত কণা। এছাড়া এটোমিক রিয়েক্টর থেকে নানা তেজস্ক্রিয় কণা ক্রমান্বয়ে বায়ুমন্ডলকে দূষিত করে চলেছে।

প্রতিনিয়ত আমরা যেসব বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমন্ডলে চালান দিয়ে যাচ্ছি তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। ভূপৃষ্ঠের ৪৭ থেকে ৭৭ কিমিঃ উচ্চতা পর্যন্ত রয়েছে ওজোন মন্ডল। ঐ মন্ডলে রয়েছে অধিক মাত্রায় ওজোন গ্যাস। ওজোন গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক অতি বেগুনী রশ্মিকে পৃথিবীপৃষ্ঠে আসতে দেয় না। মাঝপথেই তাকে শোষণ করে নেয়, যার ফলস্বরূপ পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। এই অতি বেগুনী রশ্মি ওজোন মন্ডলে যত বেশি পরিমাণে শোষিত হবে, পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা তত স্বাভাবিক হবে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের ত্বক কোষগুলি নীরোগ হবে। কিন্তু ওজোন মন্ডলের এই ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মহা জাগতিক অতি বেগুনী রশ্মি ভূপৃষ্ঠে নেমে আসার ফলে পৃথিবীর প্রাণীকুলের উপর প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। এছাড়া বায়ুমন্ডল উত্তপ্ত হওয়ার ফলে মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বরফ গলে নিম্নাভিমুখী হতে শুরু করেছে। গবেষণার দ্বারা জানা গেছে যে, এইভাবে বরফ গলতে থাকলে আগামী একশ বছরের মধ্যে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি প্লাবিত হতে বাধ্য। সূর্যের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলের বাষ্পায়নের হার বাড়ছে। এইভাবে দিন দিন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার ফলে বিপদের আশঙ্কায় মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে প্রকৃতির লুণ্ঠিত ভান্ডার পূরণের জন্য ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি হেতু যেমন বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে, অপরদিকে তেমন পূর্বের তুলনায় বৃক্ষের

পরিমাণও বাড়ছে না। বৃক্ষের জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করার ক্ষমতা অধিক। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পূর্বের তুলনায় বৃক্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়ার ফলে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা বৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসছে। বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে প্রায়ই এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাস পর্যন্ত অবিশ্রাম বৃষ্টি লেগেই আছে। স্বভাবতই প্রশ্ণ জাগে আমাদের দেশের জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে কি? পরিবেশের দিকে দৃষ্টি ফেরালেই এই প্রশ্ণের উত্তর পাওয়া যাবে। ওজোন মন্ডলে ওজোন স্তর যতদিন পর্যন্ত পূর্বের অবস্থায় ফিবে না আসছে ততদিন পর্যন্ত এই পরিবর্তন চলতে থাকবে এবং এটি সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করছে প্রাণী বনাম উদ্ভিদের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা এবং দূষণ রোধের উপর। সম্প্রতি Environmental Protection Agency জানিয়েছে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এখনও প্রচুর বৃক্ষের প্রয়োজন। একমাত্র বৃক্ষই ভূ-পৃষ্ঠকে দূষণ মুক্ত করে প্রাণীর জীবন ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

এখন প্রশ্ণ, ওজোন মন্ডলে ওজোন স্তর কিভাবে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে? গবেষণার দ্বারা জানা গেছে যে, অধিক বৃক্ষ রোপণের ফলে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়বে। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের মধ্যে নিঃশব্দ তড়িৎ ক্ষরণের ফলে ওজোন গ্যাস সৃষ্টি হয়। আকাশের বিদ্যুৎ ক্ষরণ বজ্রনাদের আগে ও পরে বায়ুর অক্সিজেনকে ওজোন গ্যাসে পরিণত করবে। অর্থাৎ, বিদ্যুতের কশাঘাতে বায়ুমন্ডলের অক্সিজেন গ্যাস ওজোন গ্যাসে রূপান্তরিত হবে। এভাবে ওজোন মন্ডল পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র বৃক্ষরোপণ করেই দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না। ভাবী প্রজন্মকে দূষণ মুক্ত পৃথিবী উপহার দিতে হলে কলকারখানাপূর্ণ এলাকাগুলিতে বিশেষ ধরনের যন্ত্র বসাতে হবে যা বিষাক্ত গ্যাসকে হয় শোষণ করবে নতুবা অন্য কোনও গ্যাসে পরিবর্তিত করবে এবং হিমায়ন ও এয়ার এ্যাসল যন্ত্র ব্যবহৃত যৌগের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তাকে মানুষের প্রয়োজনে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে। অপচয়ের পথে সম্পদের ক্ষয় বন্ধ করতে হবে। এছাড়া উৎপন্ন বস্তুর মানোন্নয়ন করতে হবে, যার ফলে তার জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং মেরামতের কাজ সহজ হয়ে দাঁড়ায়। সৌরতাপকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা, বায়োলজিক্যাল পদ্ধতির দ্বারা কীটশত্রু ধবংস করার পন্থা উদ্ভাবন করা, বন্য পশুপাখি হত্যা বন্ধ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সর্বোপরি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উন্নতি এবং পরিবেশকে একই সঙ্গে ভাবতে হবে যাতে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এ ব্যাপারে প্রত্যেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। দূষণ মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের দ্বারা গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মকে দূষণমুক্ত প্রকৃতি উপহার দেওয়া সম্ভব হবে না।

মডার্ণ ক্লাবের শারদ স্মরণিকা পুরস্কার - ২০২৪

এবার আগরতলার নাগেরজলাস্থিত মডার্ন ক্লাব শারদ স্মরণিকাগুলোকে পুরস্কৃত করবে। প্রথম পাঁচটি স্মরণিকাকে ট্রফি ও নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হবে। এজন্য পাঁচটি স্মরণিকা জমা দিতে হবে। এগুলো জমা দেয়া যাবে শহরের পাঁচটি স্থানের মধ্যে যে কোনো একটি স্থানে। স্থানগুলো হলো - মডার্ন ক্লাবের কাছে সংকল্প মেডিক্যালস, জগন্নাথবাড়ি রোডে অক্ষর পাবলিকেশনের বইঘর, জ্ঞান বিচিত্রা, কর্নেল চৌমুহনিতে ত্রিপুরা দর্পণ ও গান্ধীঘাটে ফরিয়াদ পত্রিকা অফিসে। যোগাযোগ : **9436482221**

গল্প

টুকাই

চন্দন আচার্য

এই শহরের মেয়র কামাখ্যা সেনগুপ্তের বাড়ির কাছেই নিবেদিতা পার্ক। সচরাচর পার্কের ভিতরে ঢুকেন না তিনি। আজ বিকেলের দিকে কোন কাজ নেই। মেঘলা আকাশ হওয়ায় গুমোট গরম পড়েছে। এদিকে আবার বিদ্যুৎ নেই। ভাবলেন, ঘরে বসে নেয়েঘেমে একশা হওয়ার চেয়ে গাছের ছায়ায় পার্কে বসলে কিছুটা আরাম পাওয়া যাবে। সেই ভেবে গুটি গুটি পায়ে চলে এলেন পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি পাকা সিটের সামনে। জায়গাটিকে ছায়া দিয়ে রেখেছে একটি বকুল গাছ। এসে দেখলেন, বেঞ্চিতে বসে একটি বছর এগার-বার বছরের ছেলে খাতা-বই নিয়ে অংক করতে ব্যস্ত। পাশে একটি সিমেন্টের বস্তা। তাতে বোধ হয় কোন কিছু রাখা আছে। কামাখ্যা বাবুকে দেখে ছেলেটি ত্রস্ত হয়ে বই খাতা গুটিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ নেয়। কামাখ্যাবাবু স্মিত হেসে বললেন---তোর অংক করা হয়ে গেছে? ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল---না,আরও কয়েকটা বাকি আছে। পরে করে নেব। যাই।

কামাখ্যাবাবু বললেন--- একটু বসে যা। আমি তোর সঙ্গে গল্প করব বলেই এসেছি। সে সন্তর্পণে বেঞ্চির এক পাশে বসে। --- তোর নাম কী? কোন সুকলে, কোন ক্লাশে পড়িস? স্পষ্ট গলায় বলল--- বলাই দাস। ক্লাশ ফাইভে পড়ি। ---ও, কোন সুকলে? ---আম্বেদকর প্রাথমিক সুকলে। তোর বাড়ি কোথায়? ---বাড়ি এই তো হাওড়া নদীর বাঁধের পাশে। তোর বাবা, মা কী করেন? বলাই ইতস্তত না করে সহজভাবে বলে--- বাবা জাল বায়, আর মা মানুষের বাড়িতে কাজ করেন। ---ও, তোর সঙ্গে এই বস্তা কেন? সে একটু সলজ হেসে বলল--- আমি টুকাই। সুকল থেকে আসার সময় রাস্তায় ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বোতল বা এই রকম জিনিস তুলে আনি। পরে বেঁচলে কিছু টাকা পাওয়া যায়। ---কী রকম টাকা পাস মাসে? ---হ, ধরেন পাঁচ-ছয়শ টাকা। এই টাকা দিয়ে কী করিস? ---আমার আর দিদির খাতা কলম আর যা কিছু কিনি। --- তোর দিদি আছে। কোন ক্লাশে পড়ে? দিদি সেভেনে পড়ে। ও ক্লাশে ফাস্ট-সেকেন্ড হয়। বেশ গর্বের সঙ্গে বলে। ---তাই নাকি! কী নাম তোর দিদির? ---নমিতা দাস। ---তো তুই ক্লাশে কিছু হস না?---না,তবে আট দশজনের মধ্যে থাকি। --- তুই এখানে বসে পড়াশুনা করিস কেন?

--- বাড়িতে ত সব সময় লাইট থাকে না। লণ্ঠনের আলোয় আধার লাগে। তা ছাড়া ঘুপছি ঘরে গরমও লাগে খুব। তাই সুকল শেষে পথে পথে ঘুরে আবর্জনা ঘেটে যা নেবার নিই। এই পার্কটা তো বাসার খুব কাছে, তাই এখানে বসে গাছের ছাওয়ায় অংকও করি, প্রশ্নের উত্তর লিখি আর একটু জিরিয়েও নিই।

এবার কামাখ্যাবাবু ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, তোর তো অনেক বুদ্ধি। যাক শোন, তোর আর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আবর্জনা ঘেঁটে জিনিস কুড়াতে হবে না। তোকে একটা কাজ দেব। ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার। তেমন কিছু না। এই পার্কে তো বিকেল সন্ধ্যায় মানুষ বেড়াতে আসে। দোকানপাটও বসে। মানুষ জিনিস কিনে খেয়ে কাগজ, খালি বোতল,পলিথিন ব্যাগ, স্টিক ডাসস্টবিনে না ফেলে যেখানে সেখানে ফেলে রাখে। ওদের কোন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান নেই। সরকারি জায়গা বলে নোংরা করে রাখবে। নিজের বাড়ি ঘর উঠোন কি ওরা অপরিষ্কার করে রাখে?

---যাইহোক, তুই সুকল শেষে আমার বাড়িতে আসবি। ওই দেখ,পার্কের দক্ষিণ দিকে দোতলা বাড়িটা। সামনে কাগজি ফুলের গাছ। চিনলি? বলাই চেয়ে দেখে মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়। ---ঠিক আছে, আমি আগামীকাল সকাল এগারটা পর্যন্ত বাড়িতে থাকব। তুই সুকল শেষে চলে আসবি। আমার বাড়িতে খাবার খেয়ে ড্রয়িংরুমে পড়াশুনা করবি। এক ফাঁকে,পার্কটা পরিষ্কার করে আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলে আবার পড়াশুনা করে খেয়ে তারপর বাড়ি চলে যাবি। এখন থেকে রাস্তায় তোকে ঘুরতে হবে না। মাসে তোকে ছয়শ টাকার ব্যবস্থা করে দেব। ঠিক আছে। ---তা কেন? জ্যাঠু, আমি তো পার্কে এসে পড়াশুনা করি। তারই ফাঁকে পরিষ্কার করে দেব। স্মিত হেসে কামাখ্যাবাবু বলেন--- তুই কোন সকালে

সুকলে আসিস। তারপর আবর্জনা থেকে বোতল আরও কত কী কুড়িয়ে এখানে পড়াশুনা করে একবারে বিকেলে যাস। ক্ষিধে লাগে না বুঝি? বলাই চোখে মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়ে বলল--- সুকলে তো মিড ডে মিল খাই। তারপর সারাদিন পথে কল দেখলে পেট ভরে জল খেয়ে নি।

কামাখ্যাবাবু কৌতুক করে বললেন--- জানিস আমি এই শহরের প্রধান। আমার কথা না শুনলে, ডাস্টবিন থেকে কোন কিছু তুললে তোকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। এই পার্কে এসেও বসতে পারবি না। তোর টাকাও মিলবে না। পার্কে বসে হাওয়া খেতে খেতে পড়াশুনাও হবে না। এখন দেখ কী করবি?

বলাই বই পত্র গুছিয়ে খানিক ভেবে বলল--- ঠিক আছে আপনার কথাই রইল। ত, এই পার্ক পরিষ্কার করে দিব আমার কাউয়া, কালু আর মিলু। ---কি বললি? তোর কাউয়া, কালু আর মিলু! এরা আবার কে? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন। এরা হইল গা আমার দুই কাউয়া, মানে কাক। ছোট থেকে ওদের পালছি। হগ আমার কথা শুনে। বাড়িতে গেলে আমার চারপাশে ঘুরতে থাকে। আমি তো ওদের ছোট্ট বেলায় কুড়িয়ে পাই। ভাত আর ছোট মাছ, শামুখের মাংস খাইয়ে বড় করে তুলেছি। তাই আমার হগল কথা শুনে। আমরা তো নদীর পাড়ে বস্তিতে থাকি। সেখানে অনেক নোংরা আর পচা জিনিসও পড়ে থাকে। শহরের মানুষও নোংরা পচা জিনিস এখানে ফেলে দিয়ে যায়। আমরা যে মানুষ, আমাদের যে কষ্ট হয় হেগো বুঝতে চায় না। তই আমার কালু, মিলুকে শিখিয়েছি নোংরা পচা জিনিষ তুলে একটা পাত্রে জমা করতে। ওরা এখন উড়ে উড়ে নোংরা পচা জিনিস দেখলে একটা পাত্রে ফেলে দেয়। তবে তারজন্য পুরষ্কারও দেওয়া হয়। একবার কোন জিনিস ফেললে একটি পাত্র থেকে একটি কুঁচো মাছ কিংবা চিংড়ি তুলে খেয়ে নেয় পুরষ্কার হিসেবে।

---তাই নাকি! তোর তো অনেক বুদ্ধি। তোকে আমি একটা পুরস্কার দেব। আমি জানতাম, কাক প্রকৃতির ঝাড়ুদার। নোংরা পচা জিনিস খেয়ে প্রকৃতিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু তুই তো কামাল করেছিস। ওদেরকে ভাল কাজে সামিল করতে পেরেছিস। চল আমার বাড়ি।

পরদিন সুকল ছুটির পর বাড়ি চলে যায় বলাই। স্নান করে খেয়ে বই খাতা নিয়ে রওয়ানা দেয় কামাখ্যাবাবুর বাড়ির দিকে। সঙ্গে ওর বড় বোন নমিতাও। কালু, মিলুও ওদের সঙ্গে উড়ে উড়ে আসছে। গেট খুলে বেল বাজাতেই কামাখ্যাবাবু দরজা খুলে দেন। ---ও তোর বোন নমিতা বুঝি? বলাই বলল--- হ্যাঁ আপনাকে দেখতে চায়। তাই আমার সঙ্গে চলে এল। নমিতা সঙ্গে সঙ্গে কামাখ্যাবাবুকে প্রণাম করে। বলাই ও প্রণাম করে। কামাখ্যাবাবু দু'জনের মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদ করে বললেন--- বসো তোমরা। ওরা বসতেই জিজ্ঞেস করেন--- হ্যাঁরে তোর কালু, মিলু কোথায়? ওরা বাইরে শিউলি গাছের ডালে বসে আছে। --- চল দেখি ওদের। ওদের জন্য কুঁচি মাছ আনিয়ে রেখেছি। বলাই বলল--- ওমা আপনি আনলেন কেন? আমি আর দিদি মিলে নদী থেকে কিছু ছোট মাছ ধরে এনেছি। ---না,এখন থেকে তোকে মাছ আনতে হবে না। আমি মাছের ব্যবস্থা করে রাখব। বলাই উঠে বাইরে গিয়ে ডাক দিল--- কালু মিলু আয়... আয়। কোন ভয় নাই। আমি তো আছি। বলাই হাত পাতলে কালু, মিলু উড়ে এসে হাতে বসে। কামাখ্যাবাবু দেখে অবাক। আমি কি ওদের আদর করতে পারব? --- হ পারবেন। ঘরে এসে বলাই কালু, মিলুকে কাঁচের টেবিলে বসিয়ে দেয়। ওরাও চারদিকে তাকিয়ে গা পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কামাখ্যাবাবু ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। ওরাও কামাখ্যাবাবুর হাতে ঠোঁঠ বুলিয়ে দেয়।

কামাখ্যা বাবু বলেন--- চল খেয়ে নিই। পরে তোদের কালু, মিলুর কেরামতি দেখব। বলাই বলল--- না,স্যার। আমরা খেয়ে বেড়িয়েছি। এই তোকে বলছিলাম না,আমার এখানে খাওয়াদাওয়া পড়াশুনা করবি। বলাই মাথা নিচু করে বলল--- আজ তো দিদি সঙ্গে এসেছে, তাই খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছি। ---ও তোর দিদিকে খাওয়ার কথা বলিনি বলে তোরা খেয়ে চলে এসেছিস। বড় ভুল বুঝেছিস আমাকে। আজ এখন তোর কালু, মিলু পার্কটা কেমন পরিষ্কার করে দেখি। তারপর না হয় এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করব। চল,ওদের জন্য কুঁচি মাছ নিয়ে আসি। --- না, আমার কাছে আছে তো। নতুন জায়গায় কাজ করবে কিনা, আগে দেখি। ওগোরা তো আর মানুষ না, পাখি। আয়রে কালু-মিলু।

ওদের পিছনে পিছনে উড়ে পার্কে আসে। এবার বলাই ডাস্টবিনের পাশে ওর আনা পলিথিনের মুখ খুলে রাখে। যার মধ্যে রাখা কুঁচো মাছ। এবার কালু, মিলু বুঝে নেয় কী করতে হবে। ওরা উড়ে যায় যেখানে পলিথিন, মোড়ানো কাগজ, রাংতা, সিগারেটের টুকরো, আইসক্রিমের বাঁটি, স্টিক, বিভিন্ন ঠান্ডা পানীয়ের বোতল, প্যাকেট পড়েছিল। ঠোঁঠে করে একটা জিনিস এনে ডাস্টবিনে ফেলে আর পলিথিনের প্যাকেট থেকে একটি মাছ তুলে খেয়ে নেয়। এই অভিনব কাকের কেরামতি দেখতে চারদিকে পথচারী দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেউবা মোবাইলে ফটো তুলতে ব্যস্ত। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পার্ক পরিষ্কার হয়ে গেল। জনতার হাততালিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠে।

মহর্ষিনী

ভারতীয় সংস্কৃতিতে লতা মঙ্গেশকর

অনিন্দিতা দে

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম সেরা ও সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী সংগীত শিল্পী হিসেবে গণ্য করা হয় লতা মঙ্গেশকরকে। তিনি ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ব্রিটিশ ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা ছিলেন দীননাথ মঙ্গেশকর। যিনি ছিলেন একজন মারাঠি ও কোঙ্কিণী সঙ্গীতজ্ঞ এবং মঞ্চ অভিনেতা। আর তার মাতা ছিলেন সেবন্তী মঙ্গেশকর যিনি বোম্বে প্রেসিডেন্সির কালনারের একজন গুজরাতি নারী ছিলেন।

পাঁচ বছর বয়সে বাবার পরিচালিত গীতি-নাট্যে অভিনয় করেন। ১৯৪১ সালে রেডিওতে দুটি গান রেকর্ড করেন। তার প্রথম হিন্দি গান মারাঠি - ''জগভাউ'' নামক ছবিতে। তারপর ১৯৪৮ সালে প্রযোজক সশধর মুখোপাধ্যায়ের 'শহীদ' ছবিতে তিনি সুযোগ পান এবং মজবুর সিনেমায় 'দিল মেরা তোরা' গানে বিশেষ জনপ্রিয়তা পান।

লতা মঙ্গেশকর তার কর্মজীবনে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। ১৯৮৯ সালে ভারত সরকার তাকে 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। তিনি ২০০১ সালে 'ভারতরত্ন', ১৯৯৯ সালে 'পদ্মবিভূষণ', ১৯৬৯ সালে 'পদ্মভূষণে' ভূষিত হয়েছেন। ২০০৭ সালে ফ্রান্স সরকার তাকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'লেজিওঁ দনরের' অফিসের খেতাবে ভূষিত করে। ১৯৭৪ সালে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গান রেকর্ড করার জন্য গিনিস বুক অফ রেকর্ডে তার নাম উঠে এবং এই সালেই তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে সংগীত পরিবেশন করেন। বাংলাতে ২০০ টি গান, ১৫ হাজারেরও বেশি হিন্দি গান এবং ভারতের ৩৬ টি আঞ্চলিক ভাষায় ও বিদেশী ভাষায় গান গাওয়ার একমাত্র রেকর্ডটি তারই। ১৯৯০ সালে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করা হয়।

পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে লতা ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। তারা হলেন আশা ভোঁসলে, উষা মঙ্গেশকর, মীনা মঙ্গেশকর ও হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর। ২০২২ সালের ৮ই জানুয়ারি তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ের ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি পরবর্তী সময়ে করোনা মুক্তও হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার দরুন ৬ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা ১২ মিনিট নাগাদ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতীয় সংগীত জগতে তার অবদান অপরিসীম। আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি, শচীন তেন্ডুলকর, রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরাগভীর শোক প্রকাশ করেন তার মৃত্যুতে। সরকারের পক্ষ থেকে দুদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা

আর একটি নয়!

দনুজ দলনী মূর্তিতে নারী সুরক্ষিত হউক, হে কাত্যায়নী

সুব্রত সাহা

নরনারীর সঙ্গ থেকেই বংশবৃদ্ধি ঘটে। জীবজগৎ বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে নরনারী দু'জনেরই অবদান অনস্বীকার্য। এ পৃথিবীকে যা কিছু সৃষ্ট চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করেছে নারী, অর্ধেক তার নর। বিবাহ বা লিভ-ইন-টুগেদার বৈধ হলে নরনারী একসঙ্গে থাকার অনুমতি পায়। ভারতবর্ষের মত সনাতন দেশে লিভ-ইন-টুগেদারের বৈধতা নেই। আইনি বিধিসম্মত বিবাহ সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বীকৃতি পায়। সেই মোতাবেক বিবাহ দুই আত্মার মিলন তথা বন্ধন বা সামাজিকভাবে সসম্মানে গৃহীত হয়। নরনারীর জৈবিক প্রক্রিয়া থেকেই বংশগতির গতি বাড়ে। ধর্ষণ জৈবিক প্রক্রিয়াজাত ক্রিয়াকর্ম নয়। জোর করে বিবাহ বা তুলে নিয়ে ধর্ষণ এখনকার সমাজের সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ১৮ বছরের নিচে বিবাহ রুখতে প্রশাসনিক তৎপরতা বর্তমান ডিজিটাল যুগেও চোখে পড়ার মতো। প্রশাসন ও পুলিশের গলদঘর্ম ছুটে এই বাল্য বিবাহ রুখতে। এ ধরনের অসামাজিক ও ন্যক্কারজনক ঘটনা দিন কে দিন বেড়েই চলেছে।

সম্প্রতি কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের ন্যক্কারজনক ও নিন্দনীয় ঘটনায় গোটা দেশ তোলপাড়। প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, কর্মবিরতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিবাদমূলক ক্রিয়াকর্মের পাশাপাশি চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে দেশে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল গত মাসাধিক কাল আগে। দেশব্যাপী এই বিক্ষোভের মুখে শেষ অবধি দোষীদের শাস্তির ভার সি বি আইয়ের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ণ হচ্ছে ভারতবর্ষের মতো সনাতন ধর্মীয় দেশে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা দিন দিন বাড়ছে কেন? এ থেকে কি নিস্তার নেই? একটু আলোকপাত করা যায়।

পাশ্চাত্য দেশে 'লিভ-ইন-টুগেদার' বৈধ হলেও আমাদের দেশে এর বৈধতা নেই। ফলস্বরূপ নরনারীর নিজেদের পছন্দের ইচ্ছা থাকলেও লোকলজ্জার ভয়ে একে অন্যের কাছে আসতে সঙ্কোচ বোধ করে। তখন তাদের মধ্যে জৈবিক চাহিদা তুঙ্গে উঠে। একটা সময় উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে নারীর ইচ্ছা থাকলেও লোকলজ্জার ভয়ে নরের কাছে ধরা দেয় না বা নর নারী লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম নিবেদন করে। প্রেম বা ভালবাসাতে অন্যায় কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেম বিরহ বা লায়লা-মজনুর অমরপ্রেম প্রেমিক প্রেমিকার কাছে পাথেয় হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বর্তমান যুগের প্রেম বা ভালবাসার মধ্যে সেই morality নেই। ডিজিটাল প্রেম বা ভালবাসার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ রাধা বা লায়লা মজনুর মতো রসও নেই। ফলস্বরূপ প্রেমে প্রত্যাক্ষিত হয়ে ভালবাসার মানুষকে খুন করতেও পিছপা হয় না। গত ২ সেপ্টেম্বর কাঞ্চনপুর মহকুমায় গা ছমছম করা ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় প্রেম বা ভালবাসার নির্দয় দৃষ্টান্ত। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভালবাসার মানুষকে নিষ্ঠুরতার চরম পর্যায়ে গিয়ে খুন করে নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে জনৈক যুবক। মেয়েটি কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। বীভৎসতার এই নিষ্ঠুরতম ছবি অহরহ আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে। গৃহ শিক্ষকের বাড়ি থেকে ফিরছিল যুবতী মেয়েটি। হঠাৎই রাস্তা আগলে ধরে যুবতীর সামনে এসে দাঁড়ায় এক যুবক। মাত্র মিনিট খানেকের কথাবার্তা চলার মধ্যেই হঠাৎ ওই যুবক ধারালো ভোজালি দিয়ে অসহায় মেয়েটির গলা ও বুকে ৮ থেকে ১০ বার আঘাত করে। মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে যুবকটি নিজের শরীরে আঘাত করতেও বেশি দেরি করেনি। নিজের শিরা কেটে, কণ্ঠনালী কেটে নিজেও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে পুলিশ এসে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেও শেষ রক্ষা হয়নি। নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতম আত্মহনন ও খুন আজ আমাদের বিবেককে বারবার দংশন করছে।

জেনাশেন জেড। সংক্ষেপে যাকে বলে জেন-জি। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১২ থেকে ২৭ বছর বয়সী বর্তমান প্রজন্মের এই জেন-জি'র জন্ম থেকে বেড়ে উঠা পুরোটাই ইলেকট্রিক ডিভাইস নির্ভর। ফলে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এই জেন-জি'রা অনেকাংশে অন্তঃসারশূন্য বীভৎস। পৃথিবীর তাবৎ মনোবিজ্ঞানীরাও ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস নির্ভর এই প্রজন্মকে এখনো ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছে না। এই জেন-জি একদিকে যেমন ব্লু-হুইল নামক একটি মোবাইল গেজের চক্করে পড়ে মুহূর্তেই নিজেকে শেষ করে দিতে পারে। ঠিক তেমনি মোবাইল গেম

খেলার জন্য টাকা চেয়ে না পেয়ে গর্ভধারিনী মাসহ গোটা পরিবারকে ঠান্ডা মাথায় কবর দিতে পারে। বিবর্তিত প্রজন্ম জেন-জি' র উন্মত্ত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। এতটা নৃশংসতা, এতটা হটকারিতা এই প্রজন্ম পায় কোথা থেকে? মনোবিজ্ঞানীদের মতে নর নারী একে অপরের প্রতি আকর্ষণ থাকে বংশগতির পরম্পরায়। পছন্দসই বিবাহ বা ভালবাসার পরিণতি ভয়াবহ হলেই এ ধরনের হিংস্রতা দেখা দেয়। কাঞ্চনপুরের ঘটনাটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নরনারী একসঙ্গে মেলামেশা করার পর হঠাৎ যখন একজন অপরজনের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয় তখনই এ ধরনের নারকীয় ঘটনা ঘটে থাকে। এ অসম্পূর্ণতার মধ্যেই জোরপূর্বক মেলামেশা বা ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে। আবার অনেকক্ষেত্রে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা সাজানো নাটক বা ইচ্ছপূর্বক ব্যাভিচারের কথাও উঠে। নারী তার চাহিদা মতো সম্পদ না পেলে ধর্ষণের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনায় অসহায় নরকেও ফাঁসিয়ে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ডিজিটাল জমানায় জেনারেশন ডেজ বা জেন-জি'র অপকর্মে সামাজিক অবক্ষয়ের চরম পর্যায়ে দিয়ে পৌঁছেছে গোটা সমাজ ব্যবস্থা।

বছর দুয়েক আগে কমলপুরের দুরাই শিববাড়ি এলাকায় ১৫ বছর বয়সী এক কিশোর শুধুমাত্র কয়েকটি টাকা চেয়ে না পাওয়ায় তার মা, বোন, দাদু এবং এক প্রতিবেশী মহিলাসহ চরজনকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে মাটি চাপা দিয়েছিল। এইসব দৃষ্টান্ত কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বর্তমান প্রজন্ম যে ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে এটা তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। এই জেন-জি'রা কখনো বই পড়ে না। সংবাদপত্র ছুঁয়েও দেখে না। শুধুমাত্র গুগল, ইন্টারনেট, ফেসবুক ব্যবহার করে দিন রাত। এর সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি পরিমাণে দেখা যাচ্ছে বর্তমান ডিজিটাল জমানায়। ফেসবুকে বন্ধুত্ব করে কত জীবন যে নষ্ট হচ্ছে সে কথা বলে আর শেষ করা যাবে না। মানবিক মূল্যবোধের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত এই জেন-জি'র প্রজন্মের তরুণ তরুণীরা। ফলে এরা ক্রুরতা ও নৃশংসতায় রেকর্ড গড়েছে। আত্মকেন্দ্রিক ভোগসর্বস্বতা জীবনের মূল্যবোধকে তুলেমূলে বিনাশ করে দিচ্ছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়। মূল্যবোধের সঙ্কটে আক্রান্ত এই জেন-জি'রা জীবনের কোন মূল্যই বোঝে না। জীবন দেয়া-নেয়া দুটোই এই জেন-জি'দের কাছে ছেলেখেলা। এর আরেকটি কারণ কু-নেশা ও ডিজিটাল জমানার অপব্যবহার। খুন, রাহাজানি, ধর্ষণের মত ধিক্কারজনক ঘটনায় অতিষ্ঠ মানুষ।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে ধর্ষণ কোন জৈবিক প্রক্রিয়াজাত ক্রিয়াকর্ম নয়। এই ধর্ষণের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনায় চিন্তিত বুদ্ধিজীবি মহল। এই অসুখে সমস্ত জেনারেশন জেড বা জেন-জি'রা আক্রান্ত। সঠিক সময়ে বিবাহ বা উপযুক্ত বয়সে নর নারীর মিলনে বাধা এর একটি প্রধান কারণ। যেহেতু এ দেশে লিভ-ইন-টুগেদারের বৈধতা নেই, অতএব উপযুক্ত বয়সে নরনারীর পছন্দের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা মোটেই সমীচিন নয়। না হলে লোকলজ্জার ভয়ে একে অপরের কাছে ধরা দেয় না। ফলস্বরূপ জোর করে বিবাহ বা ধর্ষণের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এটা যে একটা ভয়ানক নিন্দনীয় ব্যাপার তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের ঘটনা জেন-জি'র বয়সী প্রজন্মের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। আর জি করের মতো নারকীয় ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষিত সমাজের কলঙ্ক। নরপিশাচদের দল (জেন-জি গ্যাং) এক ডাক্তার মহিলাকে গণধর্ষণ করে নির্মমভাবে খুন করে, যা মনে করিয়ে দেয় দিল্লির নির্ভয়া গণধর্ষণকে। বাসের মধ্যে প্রেমিকের সামনে জেন-জি গ্যাং এবং দুষ্কৃতকারীরা নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতম নারকীয় ভাবে ধর্ষণ করে মেয়েটিকে খুন করে। কলকাতা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা দেশের সব জায়গায় এই ব্যাধি থেকে নিস্তার পাচ্ছে না গোটা সমাজ ব্যবস্থা। তাই উপযুক্ত গণশিক্ষা এবং সচেতনতা ও নারী সুরক্ষার বিভিন্ন পন্থা সুকল থেকেকেই গড়ে তোলা আবশ্যক।

নারী অবলা, নারী দুর্বল এ ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দেবে অধিকার হে বিধাতা? নরপিশাচদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। সারা দেশব্যাপী এই ধরনের জঘন্যতম অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে পাপীদের বিরুদ্ধে। দনুজ দলনী মূর্তিতে নারীকে যে জাগতে হবে আজ হে দেবী-কাত্যায়নী।

সুর ছুঁয়ে

ভবানী বিশ্বাস

নিদ্রার ভেতর তোমার গান শুনি।
কোথায় যেন ভেসে যায় দূর বহুদূর

শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি আসে,
অদ্ভুত লাগে!
মায়াময় এই সুর ছুঁয়ে
তোমার সমুখে দাঁড়াই...
টের পাও তুমি!

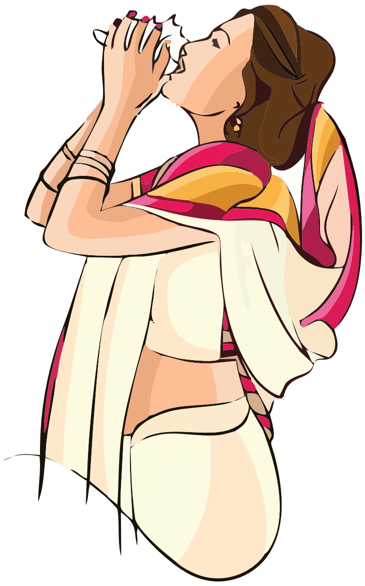

দুর্গাপূজা

রাখী দেব

দুর্গাপূজা হিন্দু বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় পূজা।
আমাদের মা যে, চির দশভূজা।
মহালয়া থেকে শুরু হয় পুজোর আগমনী গান।
কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান শুনে, জুড়াই আমার প্রাণ।
উঠানের সামনে শিউলি ফুলের গন্ধ,
প্রাণে জাগে নতুন ছন্দ।
বাদ্যযন্ত্রে চারদিন ধুমাধুম চলে,
মায়ের আরাধনা হয় জলে ও স্থলে।
পাঁচদিন আগে থেকেই চারিদিক ঝিকিমিকি রঙিন আলোয়,
মন্দ দূরে ঠেলে দিয়ে, মন ভরে থাকে ভালোয়।
সুসজ্জিত মায়ের মূর্তি দেখে,
তাকিয়ে থাকি আপন চোখে।
নয়ন নাহিকো জুড়ায়,
সময় নাহিকো ফুরায়।
নদীর কিনারায় শ্বেত কাশ ফুলের দুলন খেলা।
নতুন পোশাক পরে ছোট, বড়, লোকের শুধু মেলা।
কচি কাঁচা ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি বেলুন হাতে।
পুজোর শেষে সবার আগে
প্রসাদের লাগি হাত পাতে।
অঞ্জলীর জন্য ঠেলাঠেলি
আমি দেখি নয়ন মেলি।
দশমীর দিন বাড়িতে নানা রকমের
খাদ্য ও মিষ্টির হাড়ি।
ধনী-গরিব সবাই আনে কাড়ি কাড়ি।
বিদায়বেলা, মন কাঁদে
বসে থাকি একা ছাদে।
পুজোর শেষের দিন
মায়ের সামনে প্রদীপ ধরি।
অশুভ শক্তির বিনাশ ও
শুভশক্তির সূচনা কামনা করি।

বাহ ইন্টার্ণ বাহ

শ্যামল কান্তি দে

'ঝিমঝিম ইন হোল বডি,
এটেন্ড ড মেডিক্যাল ওপিডি
নো ব্লাড ইন দ্য বডি
আই ডু মাই ডিউটি'
হামি হইলক দেহাতি মানুষ
তমদের লিখা কিচ্ছু বুঝি লাই,
রোগের লাম বাপ বইলেছিলক
জ্বর, হাম ,বসন্ত, পেট খারাপ
ইখন শুনি হামার ঘরবালীও
ইকটা রোগ, ইত্য দিন
ই রোগ মুই পুষে আছি
ওষুধ দিতে পারি লাই,
কষ্ট হয় বৌটার লগি,
তবু বেইচে আইছে ইখন ।
বৌ কে আদর কইরে ডাকি ঝিমঝিম
আইজ ডেরায় গিয়ে বৌ কে বইলব,
ঝিমঝিম ইন হোল বডি,
এটেন্ড ড মেডিক্যাল ওপিডি
নো ব্লাড ইন দ্য বডি
আই ডু মাই ডিউটি ।

কালো অধ্যায়

সংহিতা ভট্টাচার্য

গোটা পৃথিবী তাকিয়ে দেখছে
ভয়াবহ নৃশংসতা
এক জঘন্য পাশবিকতা।

সত্য এবং ন্যায়ের পথ
শিখেছিল যে মেধাবী মেয়েটি...
তার শিরদাঁড়া ভেঙে ক্ষতবিক্ষত।
পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো সে।

সন্তানহারা আর্তনাদে প্রতিবাদের ঢেউ,

মিছিল মিটিং চীৎকার
স্লোগান...

সুষ্ঠু বিচার চাই....
অপরাধীর শাস্তি চাই

অন্ধ বিচার সুবিচারের অপেক্ষায় এখনো স্ট্রংরুমে বন্দি...
ইতিহাসের পাতায় আবারও লেখা হলো
এক কালো অধ্যায়।
এক কলঙ্কিত উপাখ্যান।

বিজ্ঞাপন প্রলোভন

দীপক রঞ্জন কর

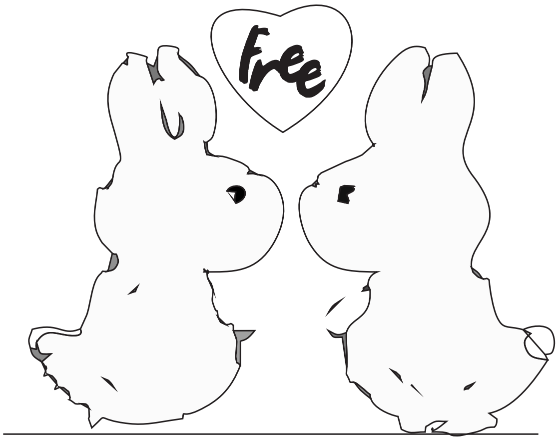

পণ্যের এখন চাহিদা নেই, পণ্যের গুণে-মানে
বাজার গরম চলছে পণ্যের শুধুই বিজ্ঞাপনে,
বিজ্ঞাপন যত আকর্ষণীয়, ততই কদর তার,
বিজ্ঞাপন বিনে খাঁটি পণ্যও পায়না বাজার।
প্রবাদ বাক্যটি আজকাল যায়না আর মানা,
বর্তমানে চকচক করে যা, ক্রেতা ভাবে সোনা।
গ্রাহককে টানছে সদাই চাকচিক্য বিজ্ঞাপনে,
ক্রেতা উপচে পড়া ভিড় বিজ্ঞাপন প্রলোভনে।

ভেজাল হউক পণ্যে প্রচারে বেশ পরিপাটি
নকল দ্রব্য চালিয়ে দিচ্ছে, প্রচার যে বড় খাঁটি,
বিজ্ঞাপন ক্রেতাগণকে বানিয়ে দিচ্ছে বোকা
ভালো-মন্দ যাচাইয়ে ভোক্তারা খাচ্ছে ধোঁকা।
বিজ্ঞাপন মাধ্যম পটু, ক্রেতা ঠেকানোর কায়দা
গ্রাহকগণকে লুটেপুটে ব্যবসায়ী নিচ্ছে ফায়দা।
'জাগো, গ্রাহক জাগো' ! প্রলোভনে দিও না পা,
নিজ বুদ্ধি বিবেচনায় জিনিস গ্রহণ কর যে তা।

দূরন্ত দূর্দম

শিমূল কুমার রায়

আমি দূরন্ত দূর্দম
চলি মনের খেয়ালে হর্দম।
মন যা চায় করে যাই,
মনের খেয়ালে চলি তাই।
নীল আকাশে ভাসি সদা
সাদা মেঘের ভেলায়।
উদার আকাশে মনের খেয়ালে
চলি সকাল সন্ধ্যে বেলায়।
গোধূলিবেলায় অস্তমিত সূর্যের রক্তিম আভায়,
ভাসাই নিজেকে মনের খেয়ালে।
খোলা প্রান্তরে দৌড়ে চলি
মনে হয় সূর্যটাকেই যেন ধরে ফেলি।
ধান্যক্ষেত্রে রবির রক্তিম আভা
ভাসায় যখন দূর প্রান্তর,
অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি সব
প্রকৃতির এত সুন্দর বৈভব।
আমি দূরন্ত দূর্দম
চলি মনের খেয়ালে হর্দম।
ব্যথিতের ব্যথায় কেঁদে উঠে মন,
তাইতো তাদের পাশে থাকতে চাই সর্বক্ষণ।
ক্ষুদ্র প্রাণীর কষ্টেও কেঁদে উঠে মন,
তাদের কথা বলতে গেলে
তোমরা বল আমি যেন একটু কেমন।
আমার মনটাই এমন
তোমাদের কাছে যারা তুচ্ছ প্রাণী,
তাদের কষ্টেও আমার মন কাঁদে
তাই আমি তোমাদের কাছে একটু কেমন জানি।
সবকিছুতেই স্বার্থ খুঁজি না
এটাই আমার স্বভাব।
তোমাদের কাছে সব আছে ভাই,
আছে শুধু এটারই অভাব।
আমি আমার মতই থাকতে চাই
বন্ধনহীন মুক্ত জীবনে
হেসে খেলে বেড়াতে চাই।
আমি দূরন্ত দূর্দম
চলি মনের খেয়ালে হর্দম।
অন্যায়ের প্রতিবাদ করি
তাই খারাপ হই মানুষের চোখে কখনো,
তবু মেকি ভদ্র সেজে
আপস করি না কখনো।
লিখি আমি আপন খেয়ালে
নিজের মনের কথা,
সুধাই শুধু জগৎটাকে নিজের অভিজ্ঞতা।
আমি দূরন্ত দূর্দম
চলি মনের খেয়ালে হর্দম।
আমার পৃথিবীতে আমি অনেক ভাল আছি,
তোমাদের পৃথিবী থেকে তাই দূরে দূরে থাকি।
সর্বত্রই দেখি স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা, আত্মকেন্দ্রিকতার আচ্ছাদন,
সত্যিকারের শিক্ষা কি কখনো আমাদের শেখায় এমন বন্ধন !
আমি আমার জগতেই বাঁচতে চাই
এখানেই আমি ভাল থাকি।
তাইতো আমি তোমাদের এই আত্মকেন্দ্রিক দুনিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখি।
শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বদা বাঁচতে চাও নিজের জন্য,
বলি অন্ততঃ কিছু তো একটা কর সমাজের জন্য।
রেখে যাও নিজের ছবি সবার মনে,
সবাই যাতে স্মরণ করে তোমায় ক্ষণে ক্ষণে।।

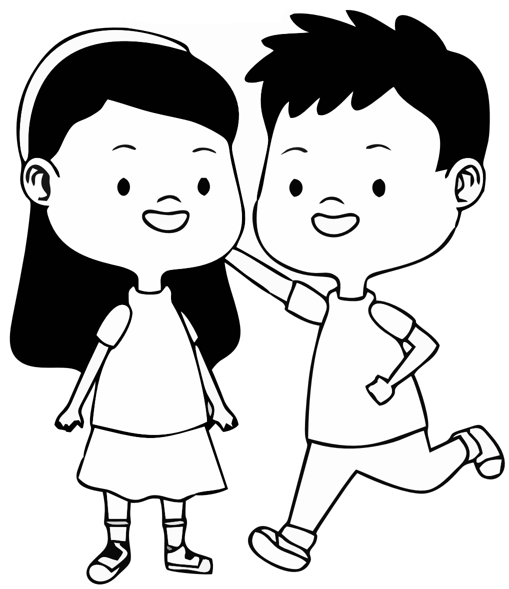

পূর্ব বিসর্জন

অরুণিমা ঘোষ

বিশ্বপালন দাতা ভগবান, না জন্মদাত্রী মায়ের পাপ?
মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়া যে এ সমাজে অভিশাপ!
যে নারী টিকিয়ে রেখেছে এ মানবকুল,
সেই নর-মানব আজ নারী দাবাতে মশগুল।
স্বাধীনতার ৭৮ বছর নর-জাতির নাম,
পরাধীনতার প্রতীক, নারীর জন্ম হারাম!
প্রশ্ণকর্তা আমি নারী, কাঠগড়াতে পুরুষকূল:
এই পুরুষশাসিত সমাজে মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়া কী ভুল?
উত্তর চাই, স্বাধীনতা, নুযনতম সম্মান ও সুরক্ষা চাই।
গণতান্ত্রিক, শিক্ষিত এ সমাজে কি এতটুকুও চাওয়ার নাই?
ধিক এ দেশে, ধিক এ দশে:
শাস্তিপ্রাপ্ত মেয়ে আমরা, এ দয়ালু দশের দোষে!
যে সমাজে দেবী পূজিত, যিনি স্ত্রী-স্বরূপ:
সেই সমাজে বাধ্য স্ত্রীজাতি মূর্তি-ময় চুপ!
শিক্ষিত সভ্য নর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মায়ের আজ অশ্রু ঝরে,
জন্মদাত্রী তোরই মায়ের আওয়াজ ধামাচাপা পরে।
চারিদিকে জাক-জমক, পুজো পুজো সাজ:
স্ত্রী স্বরূপা দেবী আজ মর্তে আসতে নারাজ!
মর্তে আসার আগের যুদ্ধে আজ অসুর বিজেতা!
মর্তে নরের ভোটে আজ পাপী-নর হয়েছে নেতা।
মহালয়াতে হবে কী এবার দেবীর আগমন?
নরকুলের হাতে যে হল দেবীর পূর্ব-বিসর্জন!

মায়ের আগমনী

মনচলি চক্রবর্তী

কান পেতে শুনো
দূরে কোথা ঢাক বাজে।
আনন্দে একসাথে
ছেলে বুড়ো সব সাজে।
শরত এসেগেছে
এসে গেছে মায়ের পুজোর লগন।
শরতের আগমনে
নদী সাজে কাশে কাশে,
পদ্ম শিউলী ফুল খুশিতে মগন।
শরতের নীল আকাশ জুড়ে
সাদা কালো মেঘেরা ভাসে।
পূজোর ডাক কাঁসর ঘণ্টার ধবনি
সন্ধ্যার বাতাসে যায় মিশে।
মায়ের আগমনীতে
পাখিরা সুরে সুরে গান ধরে।
মহামায়া দুর্গার আগমনে ধরণীর
সবার হৃদয় আনন্দে থাকে ঘিরে।

আড্ডা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

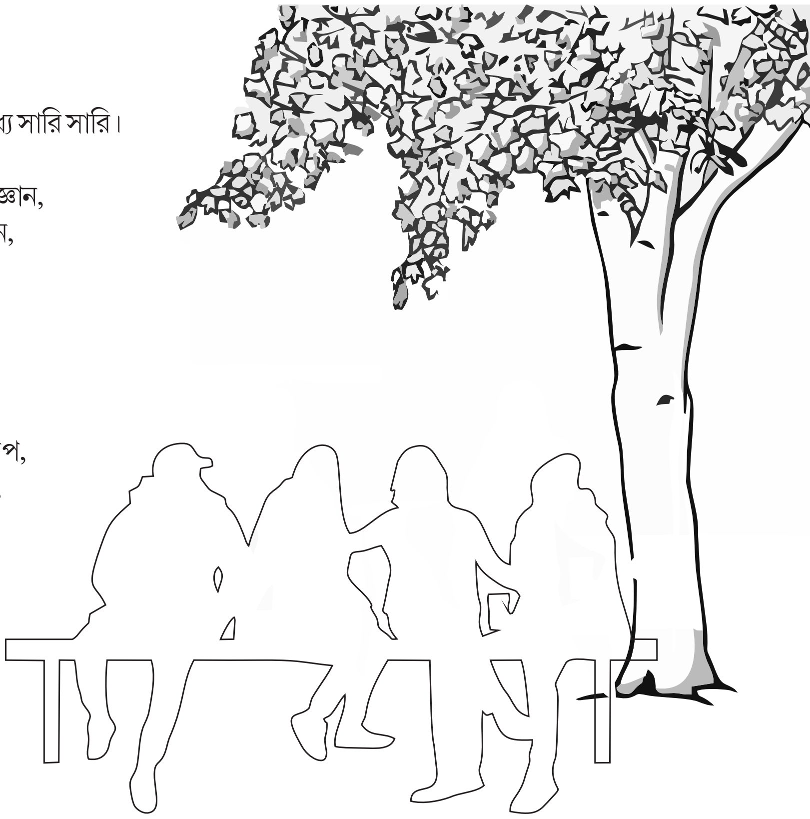

চোখ খুলে দিনের শুরুতে তোমার আবির্ভাব,
চা হাতে সে বাড়ি ই হোক বা রকে বসে পাশে রাস্তাঘাট,
বেলা গড়িয়ে যাত্রা পথে হোক বাস ট্রাম আর রেলগাড়ি,
তুমি যে বিরাজমান আড্ডা বন্ধু সকলের মাঝে সকলের মধ্যে সারি সারি।

কখনো খেলা কি কখনো দেশ বা কখনো রাজনীতি আর বিজ্ঞান,
একবার শুরু হলে তোমার মাধ্যমে সকলে পায় বিশেষ জ্ঞান,
অফিস হউক কি বন্দর ই হউক কি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান,
তুমি যে আছো সকলের মাঝে চর্চায় তোমার নাম।

কাজের পরে সন্ধ্যে হউক কি রাত ই হউক
তুমি যে কম করো মনের চাপ,
অল্প হলেও তুমি যে মাধ্যম প্রকাশ করার বিভিন্ন মানসিক চাপ,
আবার তুমি যে যোগান বিভিন্ন আনন্দের বিভিন্ন উৎসাহের,
তোমার মাধ্যমে সুসংহত হয় বিভিন্ন সম্পর্কের।

তবেযে তুমি দুরকমের ,নেতি আর ইতি,
ভয়ংকর তুমি, যদি কেউ করে আলোচনায় তোমার নেতি,
তুমি সর্বদা সার্বজনীন আর হোক সর্বদা ইতিবাচক,
তোমার মাধ্যমে দেশ জগৎ পায় সুস্থ সুসংগঠিত উপাচক।

সংক্রমণ ই হোক বা কোনো সামাজিক ব্যাধি,
তোমার আলোচনায় সমাজ পায় সুস্থ পথ দিশা,
দিকে দিকে তোমার আলাপচারিতায় কাটে কুসংস্কারের ছানি,
তোমার মাধ্যমে সমাজ পায় সচেতনতার বানি।

কিন্তু দিন দিন এখন ক্রমশ ফিকে তুমি রক আর চা এর স্টলে,
কফিহাউস এর চেয়ার থেকে তুমি এখন সোশ্যালমিডিয়ার ঘরে ,
ডিজিটাল দুনিয়ায় দেশ হতে বিদেশ ভিডিও কল হয়,
এযেন নুতন সংস্করণ তোমারই মুখোমুখি হয়।

কখনো কথায় বা কখনো টেক্সট মেসেজ আর বা কখনো ইমোজি,
ডিজিটালি মাধ্যমে এযেন নুতন সংযোজন মনের ভাব প্রকাশের উপায় কত ইজি,
কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে মনের ভাব আদান প্রদান প্রকাশের তাগিদ,
তাই তো বোধহয় ডিপরেশন আজ বাড়ছে দিকে দিক।

তুমি যে অভ্যাস তুমি যে তাগিদ তুমি যে প্রাণের রসদ,
তুমি ই পথ্য মানুষের মনে আরও জানার বিশদ,

তোমায় নিয়ে চললে বাঁচে মানুষ আর বাড়ে আয়ু,
পরিশেষে বলি তুমিই জীবনের অনন্য মূল অঙ্গ আর
'আড্ডা' তুমি মানুষকে দিচ্ছ জীবনের গড় আয়ু।

গল্প

চোখের আলোয়

ধূর্জটী কুমার সাহা

(১)

গলির মুখে এসে প্রাণকৃষ্ণের মনটা আজও কেমন যেন বিষিয়ে উঠলো। না আজও কেউ এলো না। যারা দলবল নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে আসতো তারা এখনো কেউ আসেনি। তাদের আসার সময়ও যে পেরিয়ে গেল! এখন কয়টা বাজে? লণ্ঠনের আবছা হলুদ আলোয় বাঁ হাত তুলে তাকিয়ে দেখে রাত দশটার কাঁটা ছুঁই-ছুঁই। কিন্তু এ সময়ে কারা যেন আজও এক এক করে সব বাড়িঘরের স্যুইচ অফ করে দিচ্ছে। সারা শহর অন্ধকারে ডুবে থাকে। আজও শহরে লোকজনের হাতে মোমবাতি, কারোর হাতে মশাল, মুষ্ঠিবদ্ধ হাত। শ্লোগান মিছিল, পথনাটিকা, নাচে-গানেরাত ভরপুর। মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ। দেশটা কি উচ্ছন্নে গেলো? এই পূজার মরশুমে এসব কি হচ্ছে? তাহলে এবার পূজায় মা কি আসবে না? একেবারে পথে বসার জোগাড়? এসময় কোথায় ক'টা পয়সা রোজগার হবে, তবে কি এবার দুগ্গা ঠাকুর আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবে না?

বাবার একটানা এতগুলো কথায় শঙ্করীর ঘোর কাটলো। শঙ্করী বলল : না বাবা, দেশের মানুষ আজ রাত জাগছে, আজ কাঁদছে ক্রমাগত অত্যাচার, অনাচার, খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদে।

মেয়ে শঙ্করীর কথায় প্রাণকৃষ্ণ একদম চুপসে যায়। টিভিতে, পত্র-পত্রিকায় সেও দেখেছে কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত তরুণী ডাক্তারকে পৈশাচিক নারকীয়ভাবে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা। যা সারা দেশে ও বিশ্বকে স্তম্ভিত ও নাড়িয়ে দিয়েছে।

তাহলে কি আমাদের এই ত্রিপুরায়ও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে না? বাবার কথায় শঙ্করী উত্তর দেয়--- হ্যাঁ, বাবা আমাদের এই ত্রিপুরায়ও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছড়ে পড়েছে সারা দেশের সাথে। দেশে আজ অসুর দানব জেগেছে। দেশের আজ বড়ই দুর্দিন। আর কত? আর কত? মানুষ আজ অসুর দমনে রাত জাগছে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এ রাজ্যেও আজ আমরা বঞ্চিতা ধর্ষিতা--- আর কত কাল চুপ করে থাকবো?

প্রাণকৃষ্ণের মাথায় এখন ঐ ভাঙ্গা রেকর্ডই বাজছে, ''অসুর দমনে মাঠে নামছে ওরা। মানুষ প্রতিবাদে রাত দখল করছে। এ বাতি মনে শক্তি জোগাবে। এ বাতি হাজারো মানুষের প্রতিবাদ-অনুপ্রেরণা। আর কত কাল? আর কতোদিন? অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাও যে আর একটি অন্যায় একথা ওই মৃৎশিল্পী প্রাণকৃষ্ণ ঠিক বোঝে। প্রাণকৃষ্ণ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল আহহহ। এরপর বুক ভরে এক নিঃশ্বাস নিল।

(২)

সেই অভিশপ্ত রাতের কথা- মনে করে প্রাণকৃষ্ণের কুচকানো ন্যুব্জ শরীর কাঁপছিল তির তির করে। সেই

রাতের অলীক দুর্ঘটনার কথা-সেটা ভাবতে চাই না, কিন্তু না ভাবলেও চলবে কি করে? বিচার পেলাম কোথায় আমাদে এই পরিবার? বড় মেয়ে উমার মুখ মনে পড়ে যায়। কারেন্টের শক খেয়ে যাওয়াতে উমাকে তড়িঘড়ি করে ভর্তি করাতে হয়েছিল শহরের 'সেবায়তন' নার্সিং হোমে। আজ থেকে বিশ বছর আগে। ছোট মেয়ে শঙ্করীর বয়স তখন মাত্র আট বছর। বড় মেয়ে উমার তখন উনিশ বা বিশ। তারপর উমার লাশ পাওয়া গিয়েছিল পরদিন ভোরে কলেজ টিলার লেকের জলে। সারা শহর তোলপাড় হয়েছিল। সে দৃশ্য এখনো জীবন্ত। তারপর? তারপর তো অনেক জল গড়িয়ে গেলো। প্রকৃত অপরাধী কে ছিল? এখনো তো অধরা। ওই নরপিশাচরা এখনো বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরাই তো আজ সমাজের মধ্যমণি। শঙ্করীও বলতো- ওই অসুর দানবদের বিরুদ্ধে কেন গর্জে উঠছে না মানুষ। কেন আমার বড় বোনকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল? শঙ্করী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এক অন্তহীন বিষাদে। এতদিন পরে ঘৃণার বৃষ্টি নেমেছে এই ধূসর শহরে, গ্রামেগঞ্জে, আনাচে-কানাচে। শঙ্করীর এখন বয়স বেড়েছে, বুঝতে পারে, কেন কারা উমাকে খুন করেছিল রাতের নার্সিং হোমে ওই নরপিশাচরা। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, 'অ্যা ক্লিয়ার কেস অব মার্ডার স্ট্র্যাংগল্ড টু ডেথ'। কত স্বপ্ণই না দেখছিল দু'বোন, বাবা আর মা। এরপরেই মা চলে গেল লুন্যাটিক অ্যাসাইলামে। জীবনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল তারপর থেকেই। এই রকম হাজারো ঘটনা এখনও ঘটে চলছে দিনের পর দিন এ শহরের বুকে গ্রামে-গঞ্জে, আনাচে-কানাচে। শুধু ধিক্কার জানিয়েই কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন, বহু যুগ ধরে। কী হবে এসব করে? বলে কেটে গেছে আরও অনেক বছর। আর কতো... আর কতো? এবারের লড়াই নির্লজ্জদের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনের অংশীদার তুমি আমি আর আম-জনতা সবাই। চলছে- চলবে-মানুষের উৎসব এবার আরো গভীরে। আজ বড়ই দুর্দিন। জনরোষ আছড়ে পড়েছে পড়ুক শাসকের কপাটে। দেশ-বিদেশে একটাই স্বর-জাস্টিস-জাস্টিস। দেশটা কারোরই একার নয় মুক্ত করো ভয়।

(৩)

লণ্ঠনের আলোয়ই এখন ভরসা। রাত পোহালেই বিশ্বকর্মা পুজো আর বিশ্বকর্মা পুজো থেকেই এ রাজ্যে পুজোর মরশুম শুরু হয়ে যাবে। এ ভাবনায় প্রাণকৃষ্ণ এবং মেয়ে শঙ্করীকে নিয়ে মূর্তি তৈরির কাজে আবারও হাত লাগায়। ওটাই তাঁদের একমাত্র সম্মানীয় জীবিকা। ত্রিশ বছরেরও উপরে এই সম্মানজনক পেশার সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদের এই পরিবার। এই মৃৎশিল্পকে হাতিয়ার করেই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খেয়ে পড়ে বেঁচেবর্তে আছেন। সারাবছর ধরেই প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁর মেয়ে শঙ্করী হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি গড়েন। কেনার ধুম, বায়নার ধুম সর্বদাই লেগে থাকে তাদের দুয়ারে। ওরা এখন বিপর্যস্ত। এবারের ভয়াবহ বন্যা সব শেষ করে দিয়েছে। কি নিয়ে এবং কি দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াবে। এক অন্ধকার ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে আজ তাঁর এই পরিবারকে।

গত মাসের বন্যার কথা মনে আসতেই গা শিহরে ওঠে। ভয়াবহ বন্যার খোলা জল চাল ছুঁই ছুঁই। সমস্ত জলবন্দি হয়েছিল ওরা। এরপর এক কাপড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ত্রাণ শিবিরে প্রাণকৃষ্ণ তার মেয়ে শঙ্করীকে নিয়ে। হপ্তাখানেক পর ত্রাণ শিবির থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই চক্ষু চড়ক গাছ। নিঃস্ব। নিঃস্ব তাদের চারদিক। হাহাকার।

আগামীদিনে কি ভাবে ঘুরে দাঁড়াবে তা এখনও বুঝে উঠতে পারছে না তাঁর এই পরিবারকে নিয়ে। পরিবার বলতে ওরা বর্তমানে দুজনেই, প্রাণকৃষ্ণ ও শঙ্করী। বন্যার আগে চালাঘরে রাখা ছিল তাদের হাতে গড়া বেশ কিছু দেবদেবীর মাটির মূর্তি। প্রলয়ঙ্করী বন্যার ঘোলা জল ঘরে ঢুকে সব কটা মূর্তিই কাঁদা মাটির ঢেলা করে রেখেছে। ঘর দুয়ার, জামা-কাপড়, বিছানা পত্তর, রং করার স্প্রে মেশিন সব কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কাঁদা বালি আর হাঁটু সমান পলিতে একাকার...

(৪)

উমা লাশ হয়ে যাওয়ার পর শঙ্করীই প্রাণকৃষ্ণের একমাত্র ভরসা। এবছর ডিসেম্বর বাইশ পেরিয়ে পা রাখবে তেইশে। যুবতী চেহারা, ক্ষীণ কটি, রাস্তায় বেরুলে নির্ণিমেষ নয়নে অনেকেরই লোভাতুর দৃষ্টি শঙ্করীর ভরা যৌবনে আছড়ে পড়ে, তা ভাল করেই প্রাণকৃষ্ণ বোঝে। চোখ এড়ায় না। করুণার ঝড়ে প্রাণকৃষ্ণের স্ত্রী গত হওয়ার পর থেকে শঙ্করীই সামলায় ঘরের খুঁটিনাটি সব। লেখা-পড়া, সুকল কলেজের ফাঁকে ফাঁকে বাবার মূর্তি তৈরির কাজেও হাত লাগায় বিশেষ করে এই পূজার মরশুমে।

বড় মেয়ে উমা 'সেবায়তন' নার্সিং হোমে লাশ হয়ে যাওয়ার পর থেকে শঙ্করীই বাবার আদ্যোপ্রান্ত প্রাণ। আসা যাওয়ার পথে পুটলি বেঁধে দুবেলা খাবার পৌঁছে দিয়ে যায় মূর্তি তৈরির এই আস্তানায়। দেখতে দেখতে শঙ্করীর বয়স বেড়ে যাচ্ছে। ওর সব বন্ধু-বান্ধবী অনেকেই এখন চাকুরে, কেউ কেউ এখন ঘর-সংসারও করছে, ছেলেমেয়ে সামলাচ্ছে। অনার্স, বি. এড। চাকরি বা নিদেনপক্ষে একটা ভাল ছেলে দেখে পাত্রস্থ করা। কিন্তু তাও করতে পারলেন কই। বিয়ে বা সমন্ধের কথা বললেই রে-রে করে ওঠে শঙ্করী। বড় বোন উমার কথা বলে তার চোক্ষে আগুন ঝড়ে, দাঁত কিড়মিড় করে বলে এর প্রতিশোধ আমি নেবই বাপ। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়াতে দাও। প্রাণকৃষ্ণ শঙ্করীর সাথে দ্বিমত করেনা। চুপ করে থেকে যায়। শেষ তুলির টান দিতে দিতে ভাবে প্রত্যেকটা ভাবী মা এক একজন দুর্গা মা হয়ে উঠুক।

(৫)

ত্রাণ শিবির থেকে ফিরে এসে হপ্তাখানেক হাতে কোন কাজ ছিল না প্রাণকৃষ্ণের। মাটির বসত ঘর ভেঙ্গে

মাটির সাথে মিশে গেছে। এখনো চোখে ভাসে সে দৃশ্য। চোখের নিমেষেই ঘরের আস্থানায় অ-ঠাই জল। অনেক টাকার মাল জলের নিচে চলে গেল। কিছুই রক্ষা করা যায়নি। যৎসামান্য জমানো টাকা সবই তো-খরচা হয়ে গেল ঐ ক'টা দিনে। কি নিয়ে আবারো ঘুরে দাঁড়াবে!! সরকারি ত্রাণ কিছুই আসেনি। আর আসবেই বা কি? বেসরকারি ত্রাণ, জামাকাপড়, চাল ডাল তেল নুন ইত্যাদির উপরই এখনো দাঁড়িয়ে আছি৷ শুনেছি সরকারি ত্রাণ তহবিল দিনদিন স্ফীত হচ্ছে। চারদিক থেকে আসছে অনুদানের হিড়িক। কিন্তু আমাদের ঝুলিতে কি ঢুকবে এর ছিটেফোঁটা। কই আমাদের তো কোন খোঁজ খবর নেয়নি প্রশাসন?

এসব কথা ভেবে লাভ নেই তোমার বাবা! যার কেউ নেই তার আছে ভগবান। মেয়ে শঙ্করীর একথায় প্রাণকৃষ্ণের অতসব ভাবনা ছেদ পড়ে যায়। বলে না মেয়েরা নাকি অন্নপূর্ণা। ঠিক তাই। এ কিন্তু কথার কথা নয়, সত্যিই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাণকৃষ্ণের জীবনেও। বেসরকারি ত্রাণের যৎসামান্য টাকা ও টিউশনির টাকা থেকে জমানো হাজার বিশেক টাকা শঙ্করী এ মুহূর্তে তুলে দেয় বাবার হাতে। এতে প্রাণকৃষ্ণের ঠোঁটে একটুখানি মৃদু হাসি ফুটে উঠে। মেয়ের দেয়া হাজার বিশেকের সাথে আরও জমা করে হাজার দশেক বায়নার টাকা। সর্বসাকুল্যে এই হাজার ত্রিশেক টাকা নিয়ে নতুন উৎসাহে উঠে পড়ে লেগে যায় প্রাণকৃষ্ণ। জোগাড় করে নেয় মাটি, বাঁশ, কাঠ, খড়, সুতলি, মুলি, পাট, রঙ, ঝালর আর অন্যান্য প্রতিমার আভরণ।

পূজার আর মাত্র হাতে গোনা ক'টা দিন। এই সময়ে এই সুযোগেই ঘুরে দাঁড়াতেই হবে এই ঘোর দুর্যোগ দিনে--- এই প্রতিজ্ঞায় প্রাণকৃষ্ণ মূর্তি তৈরীর কাজে হাত লাগায় প্রাণপনে। দিনে ও রাতে। অনেক রাত করে হাতের কাজ শেষ করে শঙ্করীও সময়ে অসময়ে বাবাকে নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাবাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মনোযোগ দিয়ে। লক্ষ্য করে এই সত্তরোর্ধ বয়সেও বাপের হাতের টান!! ডান হাতে তুলি, বাঁ হাতে ছোট্ট একটা রঙের পাত্র শেষ পর্যায়ের ফিনিশিং টাচ। অসুরের বুকে বল্লমের খোঁচায় রক্ত বেরোচ্ছে। এত জীবন্ত! শঙ্করী তন্ময় হয়ে তা দেখে এবং তুলির শেষ টানটা দেওয়া অবধি অপেক্ষা করে, খেয়াল রাখে বাপের সব ক'টা কাজে।

(৬)

সারা পাড়া, শহর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। বাইরের রাস্তায় লোকের জটলা চলছে। নাচ, গান, কবিতা, পথ নাটক, আবৃত্তি। চলছে অবিরাম অবিরত। জাস্টিস জাস্টিস। রাজ্যবাসী জাগো। অসুর-দানবদের বিরুদ্ধে জাগো। দেশটা কি আপনাদের নয়? 'মুক্ত করো ভয়'। এই ডাকে সাড়া দিয়ে আম-জনতা রাত জাগে। খুন, ধর্ষণ সন্ত্রাস। জনগণের নিরাপত্তাহীনতা। পাশাপাশি বন্যায় সবারই মাথায় হাত। শঙ্করীও এই ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের সাথে মিশে যায়, রাত জাগে। প্রাণকৃষ্ণ তা টের পায়। মেয়ের কোন কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

(৭)

এরই মধ্যে যাদের মূর্তি বায়না করা ছিল তারা সকলেই তাদের প্রতিমা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে উন্মাদ নৃত্য করে নিয়ে চলে গেছে তাও কিন্তু হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। একটু কম দামে পাওয়ার জন্য শেষ মুহূর্তে দরদাম করে যারা কেনে তাদেরও আসার সময় পেরিয়ে গেছে। নতুন করে আর কোন দল হই-চই রই রই করে ঢুকছে না। কারা যেন এক এক করে রাস্তার সব স্যুইচ অফ করে দিয়েছে। প্রাণকৃষ্ণ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন আকাশে তাঁরা নিভু নিভু। বাইরের আলো ফুটে চলছে। গলির মুখে এসে তাইতো প্রাণকৃষ্ণের মনটা আজও বিষিয়ে উঠল। আজ চতুর্থী। তিনি ভেবেছিলেন বায়না না হলেও শেষ পর্যন্ত সব ক'টা মূর্তিই বিকিয়ে যাবে। কিন্তু এবার অনেক মূর্তি প্রতিমাই অবিক্রিত রয়ে গেল যে? প্রলয়ঙ্করী বন্যা নাকি ধর্ষণ, খুন-সন্ত্রাস অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কারের এই বহিঃপ্রকাশ? প্রাণকৃষ্ণ তা ভেবে পায় না। তিনি ফিরে এসে দোরগোড়ার দিকে তাকান। কেউ এল কিনা। প্রাণকৃষ্ণ আবারো ভাবেন--- এগুলোও প্রতিমা, আর ওগুলোও প্রতিমা। অথচ কত তফাত। যেগুলো বিক্রি হয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে এখন চলবে মণ্ডপে মণ্ডপে আনন্দ উৎসব আর উল্লাসের ফোয়ারা, আলোর রোশনাই। আর যেগুলো বিক্রি হয়নি, যা রয়ে গেল সেগুলো ঢুকে যাবে ঘুপচি অন্ধকার গো-ডাউনে। বছর ধরে। কালি-ঝুলি-মাকড়শার আঁশ, মাখাবে সারা বছর ধরে। মানুষের জীবনটাও কি তাই? যাদের জীবনে সুযোগ আসে খুঁটির জোরে তারা ওঠে দাঁড়ায়। আর যারা পারে না চাটতে, তারা পায় না। মিলিয়ে যায় অহীন গভীরে, আটকে থাকে খুপচি অন্ধকার ঘরে? তা নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে নেয় এক এক করে।

(৮)

এবারের পূজার আনন্দটা তাহলে সবদিক দিয়েই মাঠে মারা গেলরে শঙ্করী। বাবা প্রাণকৃষ্ণের কথা শঙ্করী কোন সাড়া দেয়না কিছু সময়। তারপর একটু ভেবে বলে বাবা! সব আনন্দ কি একরকম হয়। মাইক বাজিয়ে তাতে সিনেমার গান চালিয়ে আনন্দ না হয়, না-ই হল- লড়াই করে জেতার কি কোনো আনন্দ নেই? একটা একটা করে আমরা ধর্ষকের মুখোশ খুলছি আর আমরাও আনন্দে ফেটে পড়ছি। এটাই তো বড় আনন্দ বাবা। একথা বলতে বলতেই শঙ্করী খাটের এক কোণে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, সারা রাতের খাটা খাটনির পর খাট বলতে বাঁশের খুঁটি পুঁতে মাচার মত বানিয়ে তার উপর কাঁদা লেপে দেওয়া। তার উপরে চাটাই পাতা। তার উপর শতছিন্ন এক কাঁথা। খাটের নিচে সংসারের হাঁড়ি পাতিলের মিছিল।

জানালা দিয়ে রোদ ঢুকে পড়েছে ঘরে। পাশের ক্লাবের বারোয়ারী পূজা মণ্ডপের মাইকে ভেসে আসছে বোধনের মন্ত্র। প্রাণকৃষ্ণ এবার ঘুপচি অন্ধকার ঘরের প্রতিমাগুলোর দিকে তাকান। আর একবার শঙ্করীর ঘুমন্ত মুখের দিকে এবং আরও একবার দরজার দিকে। তাহলে বাকি মূর্তি প্রতিমাগুলো সত্যি সত্যিই কেউ নিতে এলোনা।

প্রাণকৃষ্ণ আবারও দরজার দিকে তাকালেন। আর তখনই একটি প্রতিমা কখন ঘুপচি অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। তার দশটা নয়, দুটো হাত। এক হাতে একটা পুঁটলি আর বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উচিয়ে চলছে ধীর পায়ে, 'মুক্ত করো ভয়' এই অভয় দানে।

(৯)

ঠিক তখনই একটা নারী কণ্ঠের চিৎকারে চারদিক অনুরণিত হয়ে উঠল। আমি শুধু একটি বারের জন্য তোমাদের কাছে বিচার চাই, বিচার। আমি মরিনি, আমরা মরিনি। ঘন অন্ধকার হয়ে গেল প্রাণকৃষ্ণের চোখের আলো। এই ঘন অন্ধকার চোখেই প্রাণকৃষ্ণ দেখতে পেল একটা অপার্থিব নারী শরীর তাঁকে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে অক্টোপাসের মতো। প্রাণকৃষ্ণ যেন দম ফেলতে পারছিল না। উমার মুখটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কী যে কি হয়ে গেল প্রাণকৃষ্ণ কিছুই ঠাহর করতে পারছিলনা। চারদিকের এই আলোর মধ্যেও অন্ধকার, কালো দেওয়াল তুলে অন্ধকার, এক ঝটকায় গা ঝাড়া দিয়ে প্রাণকৃষ্ণ নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় উমার অপার্থিব শরীর থেকে। এক বিন্দু হলুদ আলোর পথ বেয়ে ঘুপচি ঘরের উমা তখন এক হাতে পুটুলি আর এক হাত মুষ্টিবদ্ধ করে এগিয়ে চলছে। আর পেছন পেছন সেই উমাকে অনুসরণ করছিল প্রাণকৃষ্ণের লাল পাড় শাড়ি পরা অপার্থিব উমা।

(১০)

কোমরে জড়ানো গামছাটা খুলে শিড়দাঁড়া সোজা করে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছছিল প্রাণকৃষ্ণ। আর শঙ্করীও ঘুম জড়ানো চোখে বাবার হাত ধরে শিড়দাঁড়া সোজা করে যতদূর চোখ যায় উদাস চোখে সে দৃশ্য তাকিয়ে দেখছিল। একসময় চোখের চাহনি সরে গিয়ে শঙ্করীর চোখ পড়ল ঘুপচি অন্ধকার ঘরে রাখা বাবার শেষ তুলির টান দেওয়া বল্লমের খোঁচায় অসুরের বুকে। ফোয়ারার আকারে রক্তটা পড়ে মাটিগুলি যেন ভিজিয়ে দিচ্ছিল। যেন একেবারে জীবন্ত। ক্লাবের বারোয়ারী পূজা মন্ডপে তখন বাজছিল---

''অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে...।'' বাইরে শরতের নীল আকাশে রোদ তখন ঝলমল করছিল।

PIONEER
ROLLER FLOUR MILLS
Manufacturer of Best Quality
Suji, Maida, Atta & Bran
OFFICE
Netaji Chowmohani
Mantri Bari Road Extension
Agartala, Tripura (West)Pin-799001
Mobile-9436120881 Resi: (0381) 222-2571
e-mail ID:PioneerRFMills@rediffmail.com
FACTORY
Ananga Nagar, P.O.Bimangarh, Agartala
Pin-799015 Phone-(0381) 2342208

গল্প

সবার উপরে

জহর দেবনাথ

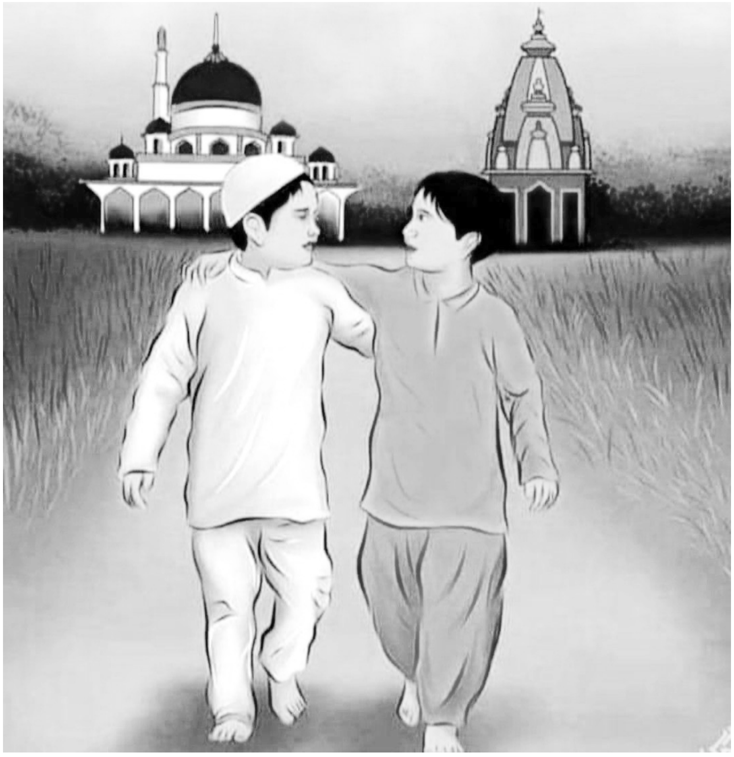

রাকেশ আর আরিফ ছোটবেলার বন্ধু। এক পাড়াতেই ওদের বাড়ি। ওদের দু'জনের পরিবারই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। রাকেশের বাবা রজত বসাক একজন তাঁতী। তাঁতে গামছা, লুঙ্গি, শাড়ি বুনে মহাজনের গদিতে দিয়ে আসেন। ওদের ছোট পরিবারে রাকেশ আর ওর ছোট বোন অনামিকা, মা আর বাবা। মা সুরবালা দেবী বাবার যোগ্য সহকারী। বাবাকে সহায়তা করার পাশাপাশি বাড়িতে দুটো গাই গরু পালন করেন। আর বাবা তাঁত বুনার পাশাপাশি বাড়ির পাশের ছোট্ট জমিতে সবজি চাষ করেন। অন্যদিকে আরিফের বাবা সাবির আলি একজন ছোটখাটো মৎস্যজীবী। নিজের দুটো পুকুরে মাছ চাষ করার পাশাপাশি নদী থেকেও মাছ শিকার করে হাটে বিক্রি করেন। রজত তাঁতী আর সাবির আলি দুজনই খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর সেই সূত্রেই এদের দুই পরিবারের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তাইতো রাকেশ আর আরিফ ছোট বেলা থেকেই এক সাথে খেলাধুলা করা, একে অপরের বাড়িতে থাকা, একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়া--- সবকিছুতেই তারা একসাথে ছিল। উভয়ের পরিবারের মধ্যেই বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে যাওয়া আসা। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে দুই বন্ধুর সম্পর্কের মধ্যে একটা অদৃশ্য ফাটল ধরতে থাকে। দেশ আর সমাজের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন অস্থিরতা শুরু হয়! এতো দিন ধরে সমাজ সংসার জেনে আসছিল হিন্দু মুসলমান সবাই একে অপরের পরিপূরক। ধর্ম আর আচার অনুষ্ঠান প্রত্যেকের নিজস্ব। কিন্তু ইদানিং এক অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপে ঐতিহ্যবাহী সেই সম্প্রীতির ভাবনায় একটা অস্বাভাবিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ভাব জেগে ওঠে। যার প্রভাব উভয় সম্প্রদায়ের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মনে ও পড়তে থাকে। পরিবারের এবং সমাজের চাপে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে ছোট বেলার বন্ধুদের মধ্যেও একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে!

আজ নববর্ষ।পাড়ার সবার বাড়ি বাড়ি সকাল থেকেই আনন্দ উৎসবের আমেজ। সবার সামাজিক ঐতিহ্য মেনে পারিবারিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। সকাল থেকেই ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খাবার দাবার আর বিকেলে পাড়ার উত্তর দিকের কালীমন্দির প্রাঙ্গণে নববর্ষ উপলক্ষে পুজো শেষে বিকেল দিকে বসে বারোয়ারি মেলার আয়োজন। আর পশ্চিম দিকে মাঠের পাশে মসজিদে সমবেত নামাজ পড়ার বিশাল আয়োজন! রাকেশ তার পরিবারের সাথে মন্দিরে যাচ্ছিল। মন্দিরের রাস্তার ঠিক বিপরীতে, আরিফও তার পরিবারের সাথে মসজিদে যাচ্ছিল। দু'জনেই একে অপরকে দেখে, কিন্তু তাদের চোখে-মুখে ছিল বিব্রত ও সংকোচের ছাপ। তারা দুজনেই একে অপরকে চিনলেও, কথা বলার সাহস পায়নি। তাদের মনে ছিল বিভাজনের অন্ধকার।

রাতে দুই বন্ধুর মনেই একটা প্রশ্ণ উঁকি দেয়, কেন আমরা একে অপরের সাথে কথা বলছি না? আমরা তো বন্ধুই ছিলাম। তাহলে আজ কেন আমরা একে অপরকে এড়িয়ে চলছি! কোনো ধর্মই তো মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না! কেবলমাত্র কয়েকজন ধর্মীয়

প্রচারকদের মনগড়া ব্যাখ্যা শুনেই একে অপরকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে!

এই গ্রামীণ এলাকায় সপ্তাহে একদিন হাট বসে। প্রতি সোমবার সকাল থেকেই গাজীপুর হাটে দূর দূরান্ত থেকে দোকানীরা বিভিন্ন পসরা নিয়ে হাটে মিলিত হয়। গ্রামবাসীরাও খুব সকাল থেকেই হাটে এসে হাজির হন। সকাল থেকেই হাট বেশ জমজমাট হয়ে উঠে।ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দামাদামি, চারিদিকে হইচই, হাক ডাক। আবার এই হাটেই দূরদূরান্ত থেকে আসা অনেক চেনাজানা মানুষদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়। কুশল বিনিময় হয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবরও আদান প্রদান হয়। কিন্তু আচমকাই বাজারের এক প্রান্তে অস্বাভাবিক একটা সুরগোল শোনা যায়। অনেকটা নাটকীয় ঘটনাই বটে। সামান্য একটা ছাগল নিয়ে দুইজন ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে প্রথমে দামাদামি, পরে কথা কাটাকাটি, একসময় তো ক্রেতা বিক্রেতা দুইজনের মধ্যে হাতাহাতি লেগে যায়। এই হাটেই রাকেশ গেছে বাড়ির প্রয়োজনীয় কিছু কেনাকাটা করতে। আর অন্য দিকে আরিফও কাছাকাছিই ছিল। হঠাৎ বাজারে দুজন অপরিচিত মানুষের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। আর সেই কথা কাটাকাটি দ্রুত হাতাহাতিতে পরিণত হলো। রাকেশ আর আরিফ ও দুইজন দুই দিক থেকে এগিয়ে আসে নেহাত কৌতূহলবশত। দুই ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে এক ছাগল কেনাবেচা নিয়ে সামান্য কথা কাটাকাটি, একসময় দেখতে দেখতে চোখের পলকে দুই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ না জেনে না বুঝে একে অন্যের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠে। দেখতে দেখতে সমস্ত হাটেই একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

রাকেশ আর আরিফ দেখল সর্বনাশ! দুই সম্প্রদায়ের মানুষগুলো অজানা অদ্ভুত এক আবেগের বশে আজকের এই হাটে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়বে। যার পরিণাম হবে অত্যন্ত সর্বনাশা আর ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক। কিন্তু না, তা ওরা হতেই দেবে না। ওরা দুজনেই সাতপাঁচ না ভেবে, কেবলমাত্র এই পরিস্থিতি ও মারমুখী জনতাকে সামাল দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

'আপনারা কি পাগল হয়ে গেছেন? কেন আপনারা এভাবে মারমুখী হয়ে উঠেছেন! না জেনে না বুঝে কেন একে অপরের রক্ত ঝরাতে উঠে পড়ে লেগেছেন?' --- রাকেশের এই চিৎকার শুনে উভয় পক্ষের মারমুখী জনতাএকবারের জন্য থমকে দাঁড়ায়।

এই দিকে আরিফও রাকেশের সাথে একমত হয়ে বলে, 'আপনারা কি কেবল মাত্র দুই ধর্মের মানুষ বলে একদল আরেক দলের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটিতে মেতে উঠবেন! আপনারা কেন ভুলে যাচ্ছেন যে, কোনো ধর্মই মানুষে মানুষে বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য নয়, ধর্ম আমাদের পরষ্পরের মধ্যে ভালবাসা আর সম্মান সৃষ্টির জন্যে!'

দুই বন্ধুর অনেক কথায় আর চেষ্টা শেষে ঝগড়া থামে, রাকেশ আর আরিফের চোখে চোখ পড়ে। পুরানো দুই বন্ধুর মনেই আবারো সেই পুরানো বন্ধুত্বের সুর ভেসে উঠে!

দুই বন্ধু মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, ওরা নিজেদের পরিবারের সাথে কথা বলবে। রাকেশ তার বাবা-মাকে বলে, 'বাবা আমি আর আরিফ ছোটবেলার বন্ধু ছিলাম। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব কেন ভাঙবে?' একইভাবে, আরিফও তার পরিবারের সাথে কথা বলে।

রাকেশ এবং আরিফ ঠিক করে, ওরা তাদের সমাজের মধ্যে সচেতনতা ছড়াবে। এক নতুন ভাবনার চেতনা জাগাবে। আরিফ আর রাকেশ দুই বন্ধু শলাপরামর্শ করে। ওরা ওদের সমবয়সী আরো কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে নেয়। সবাই মিলে বিভিন্ন কায়দায় সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানে সামিল হয়। বৃহত্তর সমাজকে বোঝাতে চায়, যেকোনো ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষে মানুষের মধ্যে ভালবাসা এবং পরস্পরের মধ্যে সম্মান সৃষ্টি করা।

ওরা সবাই মিলে স্থানীয় সমাজকর্মীদের সাথে কথা বলে এবং একটি সচেতনতা প্রচারণা শুরু করে। ওরা সবাই মিলে সুকল, কলেজ, এবং স্থানীয় সমাজের মানুষের সাথে আলোচনা সভা আয়োজন করে। লক্ষ্য ওদের একটাই--- 'কোনো ধর্ম বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য নয়! আমাদের আসল পরিচয় হলো আমরা সবাই মানুষ।'

তবে কাজটা যে খুব সহজ সরল আর মসৃন ভাবে হচ্ছে তা কিন্তু নয়। অনেকগুলো বাঁধা বিঘ্ন কাটিয়ে, বুদ্ধি করে আর সুপরিকল্পিতভাবে ওরা প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। আর কঠিন হলেও ওদের দলবদ্ধ প্রচারণা কাজ ধীরে ধীরে ফল দিতে শুরু করে। বৃহত্তর সমাজের মানুষ তাদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিবেশীদের মধ্যে ভালবাসা এবং সম্মানের মূল্যবোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। রাকেশ এবং আরিফের প্রচেষ্টা সমাজের মধ্যে নতুন করে ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপন করে।

একদিন, রাকেশ আর আরিফ একসাথে বাজারে হাঁটছিল। তারা দেখে, সমাজের মানুষ এখন একে অপরকে ভালবাসা এবং সম্মান দিয়ে দেখছে। তাদের প্রচেষ্টার ফল সমাজে আজ চমৎকার ভাবে দৃশ্যমান। রাকেশ বলল, 'আরিফ, আমরা আমাদের বন্ধুত্ব ফিরে পেয়েছি, আর আমাদের সমাজেও ধর্মীয় মূল্যবোধের সংকট কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে!'

আরিফ হেসে বলে,'হ্যাঁ, আমরা পেরেছি। আমরা প্রমাণ করেছি, মানুষে মানুষে ভালবাসা এবং সম্মানই সবকিছুর উপরে।'

বিজ্ঞান

শব্দ দূষণ ও পরিবেশ

পূর্ণোপমা রায় বর্মণ

আবহাওয়ার অনুকূল পরিবেশে একদিন পৃথিবী নামক এই গ্রহে জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। জীবন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এই তিনটি শব্দের উৎপত্তি হয়। এই তিনটি বিষয়ের জন্য আমরা সর্বতোভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। ভূ-পৃষ্ঠে জীবের উৎপত্তির সময় বায়ুমন্ডলে ছিল অফুরন্ত অক্সিজেন, খাদ্য এবং জলে ছিল সতেজ বিশুদ্ধতা- যার ফলে জীবের বিকাশ হয়েছিল দ্রুত।

মানবসভ্যতাকে উন্নত করার তাগিদে বিজ্ঞান যখন নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করল, ঠিক তখন থেকেই পরিবেশ দূষণের পথ একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগল। এই পরিবেশ দূষণে আজ শুধুমাত্র মানব সমাজই নয়, তার সঙ্গে সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। পরিবেশ প্রধানত দূষিত হয় বায়ুদূষণ এবং জল দূষণের মাধ্যমে। আজ বায়ুদূষণ এবং জল দূষণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে শব্দ দূষণ। কিন্তু প্রশ্ণ হল শব্দ দূষণ কিভাবে ঘটছে? রাস্তায় মোটর গাড়ির হর্ণ, বোমা ও বাজির শব্দ, কলকারখানা, রেডিও, টেলিভিশনের আওয়াজ, মিছিলের ধবনি-প্রতিধবনি, জন কোলাহল, মাইকের চড়া সুর ইত্যাদি শব্দ দূষণকে বায়ু দূষণ এবং জলদূষণের সঙ্গে স্থান করে দিয়েছে। শহর ও শহরতলিতে আজ শব্দ দূষণের প্রধান অস্ত্র কর্ণবিদারী এয়ার হর্ণের শব্দে মানুষ অতিষ্ঠ। এয়ার হর্ণের আওয়াজের পরিমাণ ৫০ ডেসিবেল এর অনেক বেশি। আবার কখনো কখনো তা ২০০ ডেসিবেলও ছাড়িয়ে যায়, যা মানুষের কানের পক্ষে বিপজ্জনক।

বাস, ট্রাক, দূরপাল্লার বাসের উৎকট এয়ার হর্ণের জন্য রাস্তার কাছাকাছি বাড়িতে সুস্থভাবে কাজকর্ম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা বিঘ্নিত হয়। পথচারীদের ক্ষেত্রে এয়ার হর্ণের হঠাৎ আওয়াজে বিভ্রান্ত হওয়া ও দুর্ঘটনায় পড়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া এই জাতীয় হর্ণের আওয়াজ বৃদ্ধবৃদ্ধা ও হৃদরোগীদেরও প্রাণহানি ঘটাতে পারে। পাশাপাশি সক্রিয় আছে নানা বাজি এবং বোমার শব্দ, নানা অনুষ্ঠানের চড়া আওয়াজের মাইকের শব্দ। বাজির আওয়াজের পরিমাণ প্রায় ১২৫.৩৫ ডেসিবেল এবং মাইকের আওয়াজের পরিমাণ প্রায় ১০০ ডেসিবেল। এই সবকিছুর শব্দে নাগরিকরা নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। শিশুরা বধির হয়ে যাচ্ছে এবং বড়দেরও নিস্তার নেই। ইলেকট্রিক এয়ার হর্ণ মোটর গাড়িতে লাগিয়ে আধুনিক নাৎসীরা তাদের বীরত্ব প্রচার করছে সবাইকে বধির করে দিয়ে। এই সমস্যা থেকে বাঁচাতে সকল ক্ষেত্রে নানা ধরনের উচ্চ শব্দ নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে কার্যকরী করার প্রয়াসও নিতে হবে। সরকারের পাশে জনগণকেও এই সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে।

বিজ্ঞান

মঙ্গল গ্রহকে বাসযোগ্য করার সম্ভাবনা

.. গ্রহটিকে পৃথিবীর মতো বাসযোগ্য করে তোলার পাশাপাশি এতে মানুষের আবাসস্থল তৈরির সম্ভাবনা জেগেছে।

মঙ্গল গ্রহকে বাসযোগ্য করে তুলতে এর বায়ুমণ্ডলে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি ধূলিকণা ছিটানোর লক্ষ্য নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

এ যুগান্তকারী আইডিয়া বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবিত বেশ কিছু বৈপ্লবিক উপায়ের একটি, যেখানে গ্রহটিকে পৃথিবীর মতো বাসযোগ্য করে তোলার পাশাপাশি এতে মানুষের আবাসস্থল তৈরির সম্ভাবনা জেগেছে।

এ মুহূর্তে মঙ্গলের পৃষ্ঠ বাসযোগ্য নয়। গ্রহটির আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা ও নিয়মিতই এতে মারাত্মক অতিবেগুনী রশ্মি'র বিস্ফোরণ ঘটে। এ ছাড়া, এর মাটি লবণাক্ত, বাতাসের ঘনত্ব কম। এমনকি এখন পর্যন্ত সেখানে প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞানীদের দাবি, তাদের তৈরি করা নতুন পদ্ধতির কার্যকারিতা আগের বিভিন্ন প্রকল্পের তুলনায় পাঁচ হাজার গুণেরও বেশি।

এতে বিভিন্ন এমন উপাদান ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে, যা সহজেই মঙ্গল গ্রহে পাওয়া যাবে। ফলে, পৃথিবী থেকে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে যাওয়া বা সেগুলোকে মঙ্গলের মাটিতে খনন করার মতো প্রয়োজনীয়তা নেই।

গবেষকরা সতর্ক করেছেন, এ প্রস্তাবনা বাস্তবে পরিণত করতে আসলে বেশ কয়েক দশক সময় লাগতে পারে। তবে, বিশাল কর্মযজ্ঞের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে, সেখানে অন্যান্য প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা এর চেয়েও কঠিন।

মঙ্গল গ্রহকে বাসযোগ্য করে তোলার প্রথম প্রস্তাবনাটি এসেছিল ৭০'র দশকে। এর পর আরও ৫০ বছর কেটে গেছে, যেখানে গবেষকরা মঙ্গল গ্রহকে পৃথিবীর মতো বাসযোগ্য করে তোলার বিভিন্ন ধরনের উপায় প্রস্তাব করেছেন।

নতুন এ প্রস্তাবনায় লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, যা মঙ্গল গ্রহে খুবই সহজে পাওয়া যায়। আর সেগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ছোট ছোট ধূলিকণায় পরিণত করতে হবে, যা গ্রহটি থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহ আটকে দিয়ে একটি গ্রিনহাউজ তৈরি করবে। গ্রহটিকে উষ্ণ করে তুলতে লাখ লাখ টন ধূলিকণা লাগবে। এ প্রস্তাবনা মঙ্গল উষ্ণায়ন সংশ্লিষ্ট আগের বিভিন্ন প্রস্তাবের চেয়ে পাঁচ হাজার গুণ কার্যকর। এতে করে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যাবে।

চালচলন

রাগ বশে নেই?

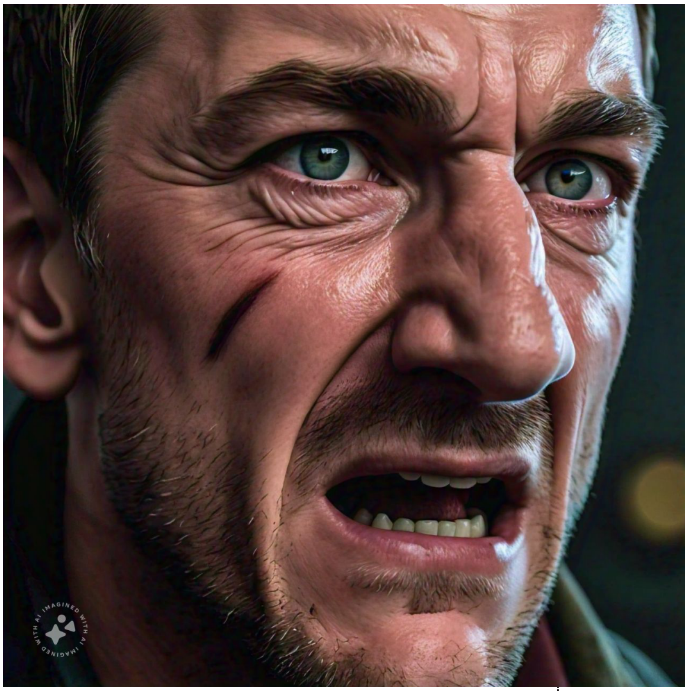

মতের অমিল হোক বা বিরূপ পরিস্থিতি পারদ একেবারে মাথায় চড়ে বসে। কোনও ভাবেই মেজাজ বশে রাখা যায় না। তার প্রভাব পড়ে সামনে থাকা মানুষগুলোর উপর। যার সঙ্গে যা নিয়ে রাগারাগি, সেই ব্যক্তি সামনে থাকলে তো কাক-চিল বসার উপায় থাকে না। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় নিজের। রাগের চোটে জিনিস ভেঙে ফেলেন, কোথায় কী রাখছেন তা ভুলেও যান অনেকে। এমন সমস্যা যদি আপনারও হয়, তা হলে সমাধান রইল এখানে। তবে তার আগে জেনে নিন রাগ কেন হয়?

রাগ হয় কেন?

১) রাগ জিনগত। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। পরিবারের কারও যদি কথায় কথায় রেগে যাওয়ার প্রবণতা থাকে, তা হলে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা সঞ্চারিত হতে পারে।

২) মস্তিষ্কের স্নায়ুর গঠনগত কোনও সমস্যা থাকলেও এই ধরনের আচরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৩) বড় হয়ে হওয়ার মুখে যদি কোনও রকম সামাজিক বা পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়, সে ক্ষেত্রেও আচরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪) হরমোনের ভারসাম্যের বিঘ্নিত হলেও মনমেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। 'অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার্যাক্টিভিটি ডিজর্ডার', অবসাদ, 'সাইকসিস', 'বাইপোলার ডিজর্ডার'-এর মতো রোগ থাকলেও রাগের উদ্রেক হয়।

৫) 'হাইপোথাইরয়েড', 'হাইপারথাইরয়েড', বা মস্তিষ্কের আঘাত লাগলেও কিন্তু আচরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করবেন কী করে?

১) শরীরচর্চা করুন। মন বা শরীর সংক্রান্ত সমস্যাকে কব্জা করার প্রাথমিক উপায় হল শরীরচর্চা করা। ব্যায়াম বা শারীরিক কসরত করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। মানসিক চাপ বশে রাখতে হরমোনেরও ভূমিকা রয়েছে। শরীরচর্চা করলে দেহে হরমোনের সমতাও বজায় থাকে।

২) একটানা কাজ করলে অনেক সময়ে মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত কাজের চাপ মনের উপরেও প্রভাব ফেলে। তার চেয়ে বরং কাজের মাঝে অল্প বিরতি নিয়ে খোলা হাওয়ায় ঘুরে আসুন। মন তো ভাল হবেই। কাজের মানও উন্নত হবে।

৩) মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখা যাবে না। কম্পিউটারের 'ক্যাশে মেমরি' পরিষ্কার করার মতো মাথা থেকে খারাপ স্মৃতিগুলো ধুয়েমুছে ফেলতে হবে। রাগ, জেদ বজায় রাখলে আদতে ক্ষতি মনেরই।

৪) মনকে অন্য কাজে নিযুক্ত রাখার চেষ্টা করুন। সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ওই এক জিনিস ঘোরালে মানসিকভাবে আরও বেশি ক্লান্তি বোধ করবেন। মেজাজও বিগড়ে যাবে।

৫) রাগ বশে রাখার আরও একটি কৌশল হল গান শোনা। স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করে সঙ্গীত। তা সে যন্ত্রসঙ্গীতও হতে পারে। আবার, অনেকে আঁকা বা ঘর পরিষ্কার করতে ভালবাসেন। ছোট ছোট কাজের মধ্যে থাকলেও কিন্তু ধীরে ধীরে রাগ ফিকে হতে থাকে।

বয়স ত্রিশ পার হওয়ার আগেই হৃদ্‌রোগ?

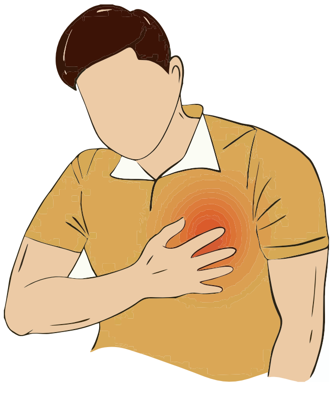

যত দিন যাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে ততই বাড়ছে হার্টের অসুখ। কোভিডের ঠিক পরে পরেই হার্ট অ্যাটাকে পরপর মৃত্যুর খবর শোনা গিয়েছিল। কেন হঠাৎ এত বেড়ে গেল হার্টের ব্যামো?

হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের অসুখ বাড়ার অনেকগুলি কারণ আছে। যার মধ্যে অন্যতম জীবনযাপনে পরিবর্তন, ভুলভাল খাওয়ার অভ্যায়, মানসিক ইত্যাদি। এ ছাড়া হার্টের অসুখের জন্য কিছু জেনেটিক বা বংশগত কারণও আছে। রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল যদি বেশি থাকে, তাহলে হার্টের স্বাস্থ্যেও তার প্রভাব পড়ে। মানুষ যত বেশি জাঙ্ক ফুডে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন, ততই রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বাড়ছে। ফলে হার্টও দুর্বল হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি মানসিক চাপ, অতিরিক্ত ওজন, ডায়াবিটিস তো রয়েছেই।

সাধারণভাবে হার্টের অসুখ থাকলে বুকে অসহ্য ব্যথা অনুভূত হয়। সেই সঙ্গে ঘাম এবং শরীর খারাপ লাগে। ক্রমাগত শরীর খারাপ করতে থাকলে হার্টের অসুখ হতে পারে। হার্টের করোনারি আর্টারি বা ধমনী ব্লকেজ থাকলে মানুষের শরীরে নানা সমস্যা হয়। অনেকসময় এই সমস্যাগুলি নিঃশব্দে দানা বাঁধে।

কারও যদি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস বা পরিবারে কারও হার্টের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস থাকে, সে ক্ষেত্রে ৩০ বা ৩৫ বছরের পর থেকেই বছরে এক বার করে হার্টের পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভাল। নিয়মিত ই সি জি পরীক্ষা, ব্লাড সুগারের পরীক্ষা এবং ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করাতে হবে। দিনে অন্তত এক মাইল হাঁটতে হবে।ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা বর্জন করতে হবে। মদ্যপান বন্ধ করতে হবে। নিয়মিত রক্তের সিরাম, লিপিড পরীক্ষা করাতে হবে। যদি কম বয়সে বাইপাস সার্জারি হয়ে থাকে, তা হলে দশ পনেরো বছর পরে আবার পরীক্ষা করানো দরকার। বাইপাস করলেও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের জন্য আসছে থ্রিডি প্রিন্টেড রক্তনালী

৩ডি প্রিন্ট করা রক্তনালীর মাধ্যমে হার্ট বাইপাস সার্জারির ফলাফল উন্নত করার রোমাঞ্চকর এক উপায় খুঁজে পাওয়ার দাবি করেছেন যুক্তরাজ্যের গবেষকরা।

নতুন এ গবেষণায় দুই ধাপের পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন 'ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবার্গ'-এর 'স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের একদল গবেষক। এতে একটি ৩ডি প্রিন্টারে ঘূর্ণায়মান স্পিন্ডল যোগ করে 'টিউবুলার গ্রাফট' বা কৃত্রিম নালী তৈরি করেছেন তারা, যেখানে ব্যবহার হয়েছে এক ধরনের জলভিত্তিক জেল।

পরবর্তীতে তারা ওই মুদ্রিত গ্রাফকে 'ইলেক্ট্রোস্পিনিং' নামের এক প্রক্রিয়ায় ঢেলে একে সক্রিয় করেছেন, যেখানে উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিভিন্ন পাতলা ন্যানোফাইবার আঁকা হয়। এ কৃত্রিম রক্তনালীর আবরণ তৈরি হয়েছিল জীবাণুবিহীন পলিয়েস্টার অণু দিয়ে।

গবেষণা দলটি বলেছে, নলগুলো কাজ করে ফ্লেক্সিবল জেলের মতো, যেগুলো প্রাকৃতিক রক্তনালীর মতো টেকসই এমনকি মানবদেহেও সহজে বসানো যাবে। এ ছাড়া, হার্ট বাইপাসে রক্তপ্রবাহের গতিপথ বসানোর ক্ষেত্রে প্রচলিত কৃত্রিম নালীর জায়গাও নিতে পারে এটি।

গবেষকরা বলছেন, এর মাধ্যমে ক্ষতচিহ্নের ব্যাপ্তি, ব্যাথা ও অপারেশনের সময় মানবদেহের রক্তনালী সরানোর ফলে ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি কমে আসতে পারে। এই টিউবগুলো এক মিলিমিটার থেকে ৪০ মিলিমিটার পর্যন্ত ব্যাস রেখে তৈরি করা সম্ভব। অপারেশনের সময় মানবদেহে ছোট কৃত্রিম নালী বসানোর জটিল কাজে ব্যর্থতার ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে। এ হাইব্রিড পদ্ধতিটি রক্তনালীতে টিস্যু সমন্বয় করার বিভিন্ন নতুন ও রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা দেখাচ্ছে।

রক্তনালীতে টিস্যু গঠনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে যেসব চ্যালেঞ্জ ছিল, সে বিষয়টিই ফুটে উঠেছে এই গবেষণার বিভিন্ন ফলাফলে। এ গবেষণায় সমর্থন ও উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে, রোগীর কার্ডিওভাস্কুলার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করা সম্ভব।

এ গবেষণার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে, এইসব রক্তনালী প্রাণীদেহে পরীক্ষা করা, যেখানে গবেষকরা ইউনিভার্সিটির 'রসলিন ইনস্টিটিউট'-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবেন। পরবর্তীতে মানুষের ওপরও এর পরীক্ষার পরিকল্পনা আছে তাদের।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই হাঁপ ধরে?

মকরাসন

ফুসফুসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে মকরাসনের বিকল্প নেই। ঠিক নিয়ম মেনে যোগাসন করলে ফল মিলবেই।

অফিসের ব্যস্ততা ও সংসারের হাজারটা কাজ সামলে অনেকে জিমে যাওয়ার সময় পান না। বাড়িতে আধ ঘণ্টা সময় বার করে যোগাসন অভ্যাস করুন। কেবল রোগা থেকেই নয়, শরীরের নানা সমস্যার সমাধান কিন্তু দূর হতে পারে নিয়ম করে যোগাসন করলে। সঠিক নিয়ম মেনে যোগাসন করলে তবেই মিলবে ফল। শিখে নিন মকরাসন।

কুমিরের মতো ভঙ্গিমার এই আসনটি অত্যন্ত সহজ। কিন্তু এর উপকারিতা অনেক। শ্বাসপ্রক্রিয়া ঠিক রাখতে মকরাসন বিশেষ কার্যকর।

কী ভাবে করবেন ?

--- ম্যাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। মাথা ও কাঁধ মাটি থেকে যতটা সম্ভব উপরে তুলুন। একই সঙ্গে দু'হাত ভাঁজ করে হাতের পাতায় চিবুক রাখুন। মাথা ও দেহের উপরের অংশের ভার দু'হাতের উপর দিতে হবে। পা ছড়িয়ে টান টান করুন।

--- আরামদায়ক দুরত্বে কনুই রেখে সামনে কিছুটা এগিয়ে আসুন। আবার আগের অবস্থায় ফিরে যান। এর ফলে পিঠের দিকে কিছুটা চাপ পড়ে।

--- মকরাসনে মূলত ঘাড় ও কোমরে চাপ দেওয়া হয়। কনুই এমন ভাবে রাখবেন যেন এই দুই অংশে সহনীয় চাপ পড়ে।

--- এই অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন ও পিঠ ও মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। ৭-১০ সেকেন্ড এই ভাবে থাকতে হবে।

--- এর পর ধীরে ধীরে চিবুক ও কাঁধ মাটিতে রেখে হাত দুই পাশে দিয়ে শুয়ে পড়ুন। কাত হয়ে উঠে বসুন।

কেন করবেন ?

শ্বাসকার্যে সাহায্যকারী প্রধান অনৈচ্ছিক পেশি মধ্যচ্ছদা। অর্থাৎ, ডায়াফ্রাম। এই ভঙ্গিমার সাহায্যে বক্ষকে স্থির অবস্থায় রেখে ডায়াফ্রামের সাহায্যে শ্বাস নেওয়া হয়। মকরাসনে তলপেট মাটিতে ঠেকে থাকে। সেই কারণে শ্বাস তলপেটে ছড়িয়ে না পড়ে কোমরের পিছন দিকে আটকে থাকে। এর ফলে এই অংশের কোনও সমস্যা থাকলে তা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসে। নিয়মিত মকরাসন অভ্যাস করলে কোমরের ব্যথা কমে যাওয়ার পাশাপাশি এই অংশের মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ফিরে আসে। অ্যাজমা বা হাঁপানি থাকলে এই আসনটি অভ্যাস করলে ফুসফুসের বায়ুধারণ ক্ষমতাও বাড়ে। মানসিক চাপ কমাতেও এই আসনটি করতে পারেন। এ ছাড়া, হজমের সমস্যা দূর করতেও এই আসন অভ্যাস করা যায়। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলেও মকরাসন করতে পারেন।

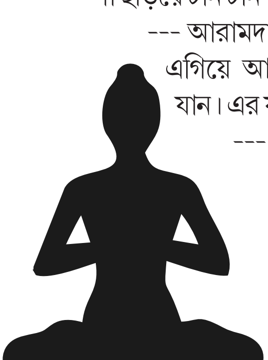

সাবধান

'সিম সোয়্যাপ স্ক্যাম'

নিমেষে ফাঁকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

অচেনা নম্বর থেকে বার বার ফোন আসে? হোয়াটস্‌অ্যাপেও অডিয়ো বা ভিডিয়ো কলের জ্বালায় অস্থির? ভুলেও এই ধরনের ফোন ধরবেন না। অথবা হোয়াটস্‌অ্যাপেও কোনও অজানা নম্বর থেকে অডিয়ো বা ভিডিয়ো কল এলে তা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ, মুহূর্তের অসতর্কতায় নিমেষে ফাঁকা হয়ে যেতে পারে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। এখন মনে হতেই পারে, মিস্‌ড কল থেকে কী বিপদ হতে পারে?

সাইবার জালিয়াতির নতুন নতুন পদ্ধতি বার করছে অপরাধীরা। ফোনে মিস্‌ড কল দিয়ে সেই ব্যক্তির সিম ও ফোনের যাবতীয় তথ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ করছে। যদি ফোনটি রিসিভ করা হয় অথবা অপর প্রান্তের ব্যক্তির কথায় ভুলে জরুরি তথ্য কেউ দিয়ে দেন, তা হলেই সর্বনাশ! জালিয়াতির এই পদ্ধতির নাম 'সিম সোয়্যাপ স্ক্যাম'।

সাইবার অপরাধীরা যাঁদের নিশানা বানাচ্ছে, তাঁদের সিম কার্ড ও ফোনের জাল নথি বানিয়ে টেলিকম অপারেটরের থেকে ফোনের নিয়ন্ত্রণ হাতিয়ে নিচ্ছে। আপনারই নম্বর থেকে ফোন করে অপারেটরকে বলছে, সিম কার্ড ব্লক করে দিতে। আসল সিম ব্লক হয়ে যাওয়ার পরে জাল সিম কার্ড ব্যবহার করে ফোনের যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ সিম অদলবদল করে নিচ্ছে আপনারই অজান্তে।

এই সিম অদলবদলের কারণে কী হতে পারে? আপনি হয়তো দেখলেন, হঠাৎ করেই ফোন ব্লক হয়ে গিয়েছে। অথবা আপনার ফোনের সমস্ত অ্যাপ, জিমেল, ই-ব্যাঙ্কিংয়ের উপর আপনার আর নিয়ন্ত্রণ নেই। তখন ফোনে ওটিপি এলে, তা সরাসরি অপরাধীদের কাছে চলে যাবে। অনেক সময়ে অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে অপরাধীরা নিজেদের ব্যাঙ্কের অফিসার অথবা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে আধারের তথ্য অথবা প্যান, ব্যাঙ্কের খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করে। মেসেজ পাঠিয়েও তা জানার চেষ্টা হয়। ভুল করেও সেই ফাঁদে পা দিলে আপনার ফোনের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে সাইবার জালিয়াতেরা।

কী ভাবে সাবধান থাকবেন?

১) যদি কেউ আপনার কাছে টেলিকম কোম্পানি বা ব্যাঙ্কের নামে ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চায়, তা হলে তা জানাবেন না।

২) অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ এলে বা কোনও লিঙ্ক পাঠানো হলে তা খুলে দেখবেন না বা উত্তর দেবেন না।

৩) বার বার অজানা নম্বর থেকে ফোন এলে সতর্ক থাকুন। দরকারে পুলিশের সাইবার সেলে যোগাযোগ করুন।

৪) যদি কেউ ফোন করে নিজেদের ব্যাঙ্কের কর্মচারী বলে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড, অথবা আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে কিছু জানতে চান, তা হলে সর্বাগ্রে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিন।

৫) অপরিচিত কাউকে নিজের আধার, প্যানের তথ্য দেবেন না। এমনকি, মেল আইডি, বাড়ির ঠিকানা, মোবাইল সংক্রান্ত কোনও তথ্যও বলবেন না।

৬) 'টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন' ব্যবহার করতেই হবে অথবা গুগ্‌ল অথেন্টিকেটর ব্যবহার করে অ্যাপগুলি সুরক্ষিত রাখতে হবে।

৭) আপনার টেলিকম অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফোনের জন্য আলাদা পিন বা পাসওয়ার্ড সেট করে রাখুন। এতে অন্য কেউ আপনার ফোনটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বা সিম ব্লক করতে পারবে না।

Explosion and Its Effects on Buildings

Mr. Souravtanu Roy & Dr. Joyanta Pal

Introduction:

The use of explosives by terrorist groups to attack civilian buildings and other structures is a growing concern in modern civilizations. Explosive devices have become smaller and more powerful, causing increased mobility and longer range impacts, resulting in immediate mortality and structural failures causing widespread life loss. Famous examples include the 1993 bombings of the World Trade Center and the 1995 bombing of the Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City. The 2008 Mumbai attacks (also referred to as 26/11 attacks) were a series of terrorist attacks that took place in 26 November 2008.

Figure 1: 26/11 attack at Mumbai

In all cases, structural failure, including glass breaking, caused much more casualties and injuries than the bomb wave itself. Following the events of September 11, 2001, which resulted in the collapse of the World Trade Center in New York. Terrorist groups are targeting civilian buildings, high-population areas, and stadiums for bombings, necessitating the introduction of engineering structures with extreme loading scenarios for structural integrity. Military research on structural resistance under explosive loads is limited, with Eurocode EN 1991-1-7 addressing unintentional loads but lacking a comprehensive method for designing under blast external stresses. US military publications like the Technical Report and Army Technical Manual offer comprehensive information and processes for explosion-resistant structures.

Figure 2: 3D representation of blast loading.

Engineers should design structures for explosive loads, calculating forces based on blast scenarios, including explosive type, weight, distance, and structure, to ensure resilience in components and connections.

Explosion and blast-loading types:

There are three types based on the explosive source's position and the structure to be protected, (a) **Free-air bursts:** The explosive charge is detonated in the air, causing blast waves to propagate outwards and directly impact the structure without any interaction with other obstacles or the ground.

(b) **Air bursts:** The explosive charge is detonated in the air, causing blast waves to propagate outwards and impinge on the structure, creating a Mach wave front.

(c)**Surface bursts:** The explosive charge detonates near the ground surface, causing blast waves to interact with the ground and propagate outwards, impacting the structure.

Explosion types have distinct blast

loadings due to reflections and interference, impacting wave intensity and pressure.

Techniques to be followed in planning: The project should consider the minimum distance for building exposure to roadways and structure type .A safety room should be constructed to minimize explosion impact and provide information to all floors. Blast-resistant buildings should have less glazing on road-facing sides to reduce glass breaking risk. Parking in basement is not recommended due to internal pressure. Water tanks should be installed at exposure faces, and fire extinguishers and exits should be provided.

As per IS 4991 : 1968, blast-resistant design of structures focuses on minimizing damage and ensuring occupant safety . Key strategies include maintaining adequate standoff distance, reinforcing walls, floors, and roofs with strong materials like reinforced concrete or steel, and ensuring ductility so that structures can absorb blast energy without sudden failure. The use of laminated or shatter-resistant glass is recommended to reduce injuries from flying debris.

These guidelines help create structures that can withstand the effects of explosions and protect occupants effectively.

Effects of blast load on ordinary people:

Blast loads can cause severe injuries to people, depending on their proximity to the explosion. The blast wave can damage air-filled organs like lungs, rupture eardrums, and cause brain injuries. Flying debris can result in lacerations, fractures, or penetrating wounds, while the force of the blast can throw people into objects, causing blunt trauma. Explosions may also lead to burns, smoke inhalation and psychological effects . The severity of injuries depends on distance from the blast, environmental factors, and protective barriers in place.

Precautions to be followed:

1. Maintain Standoff Distance: Increase the distance between vulnerable structures and potential blast sources, such as hazardous materials or explosives.
2. Reinforce Critical Structures: Use blast-resistant materials (reinforced concrete, steel) for walls, roofs, and key load-bearing elements to improve the structure's resilience.
3. Install Blast Barriers: Place protective barriers or blast walls around critical areas to absorb and deflect the blast wave away from buildings and people.
4. Protect Windows and Openings: Use laminated, shatter-resistant glass or blast-resistant windows to prevent injury from flying glass during an explosion.
5. Strengthen Connections: Ensure strong, flexible connections between structural components to prevent progressive collapse if one part fails.
6. Design for Ductility: Use materials that can undergo large deformations (high ductility) to absorb the energy from the blast without sudden failure.
7. Emergency Preparedness: Have evacuation plans, blast alarms, and training programs in place to respond quickly and safely in case of a blast event.
8. Regular Inspections: Conduct frequent checks of critical structures, windows, and barriers to ensure they remain in good condition and compliant with safety standards.

প্যারিসে লুক্সেমবার্গের হৃদয়ে ইন্ডিয়া

সরযূ চক্রবর্তী

খেলা শেষ। মাঠ ছেড়ে ভারি সব গিয়ার্স নিয়েই বেরিয়ে আসছিলেন ড্রেসিং রুমের দিকে। হঠাৎই গ্যালারীর ওপার থেকে আওয়াজ এলো 'হ্যালো শ্রীজেশ... শ্রীজেশ' । বন্ধুকে দেখেই ভারতীয় কিংবদন্তি গোলরক্ষক শ্রীজেশের মুখে একগাল হাসি। মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে সাংবাদিকদের শ্রীজেশ বলেন--- 'ইয়ে লেড়কি মেরে সব ম্যাচ দেখতি হ্যা, ইহা ভি আ গায়ি !'

বাবার কাঁধে চেপে বছর পাঁচেকের ছোট্ট মেয়েটিও হাসছে। শ্রীজেশ ছুটে গিয়ে হাত মেলালেন। কথা হল দু'জনের মধ্য। পরে শ্রীজেশ জানান--- বেলজিয়াম থেকে প্যারিসেও ছুটে এসেছে মেয়েটি। নিজের দেশের খেলা তো দেখেই, সাথে ভারতের খেলা একটাও ছাড়ে না ! কারণ একটাই, শ্রীজেশের বড় ফ্যান সে। এখন বন্ধুত্ব হয়ে গেছে দুদু'জনের !

অলিম্পিকের মত বিশাল ক্রীড়া যজ্ঞে এধরণের বহু অজানা ফ্যান রয়েছেন বিভিন্ন দেশের। যারা খেলার টানে ঘুরে চলেন এদেশ থেকে ওদেশ। শ্রীজেশের মত কিংবদন্তির ফ্যান যেমন রয়েছেন, তেমনি ভারতসহ বিভিন্ন দেশের অজানা ফ্যানও আছেন প্রচুর। তেমনই এক পরিবারের সাথে দেখা হল লা-স্টেডিয়ার হকি এড়িনার রাস্তায়।

কোলন-এর গলিপথে কাগজে নিজের হাতে ভারতীয় পতাকা এঁকে দাঁড়িয়েছিল ছোট্ট ছেলেটি ! সাথে তার মা, বাবা ও বোন। ইবোস-ডু মেনোয়া'র হকি মাঠ থেকে ফেরার পথে ইউরোপীয় এই পরিবারের সাথে তেরঙ্গা কোনো ভাবেই মেলাতে পারছিলাম না। কৌতুহল কি আটকে রাখা যায় ? 'হ্যালো' দিয়ে শুরু করি আলাপ। বাকীটা শুনে একেবারেই অবাক ! এটাও কি সম্ভব ?

ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে ছোট্ট দেশ লুক্সেমবার্গ। সেখান থেকে সকালে দু'ঘন্টা ট্রেনে চেপে প্যারিস এসেছেন এই দম্পতি দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে। ইন্ডিয়ার হকি ম্যাচ দেখতে ! ছেলেটো নিজের হাতে এঁকেছে ভারতের জাতীয় পতাকা ! সেটাই হাতে নিয়ে গ্যালারিতে সমর্থন করেছে ভারতকে ! আর ভারত জেতায় খুশী লুক্সেমবার্গের এই পরিবার ! কিন্তু কেন ?

'আই লভ ইন্ডিয়া। আই ওয়াজ এন ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড। নমস্তে ইন্ডিয়া, মেরা নাম ওলা হে' --- অনর্গল বলে দিলেন ভদ্রমহিলা ! অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই ঘটনা, লুক্সেমবার্গের ওই ভারতীয় ফ্যান জানান, তিনি হকির নিয়ম কানুন কিছুই জানেন না ! তবু ভারতের খেলা বলে দেখতে এসেছেন ! মজা পেয়েছেন পেনাল্টি শ্যুট আউট। 'আই এঞ্জয় পেনাল্টিস হোয়াট এ গ্রেট উইন' --- বলেন তিনি !

বাবা নিকোলাই-এর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটির হাতে ভারতীয় পতাকা নিয়ে জানতে চাইলে ওলা বলেন--- ভারতের পতাকা ছেলে নিজের হাতে এঁকেছে ! ভারতকে সমর্থন করতে লুক্সেমবার্গে তেরঙ্গা খুঁজে পাননি। তাই ছেলেকে দিয়ে আঁকিয়ে এনেছেন ! কোথায় কোথায়, কোন হৃদয়ে ভারতের প্রতি ভালবাসা লুকিয়ে আছে ভাবা যায় ! লুক্সেমবার্গের জাতীয় পতাকাতেও রয়েছে তিনটি রং--- লাল, সাদা ও নীল। সেই পতাকা না এনে, ভারতের পতাকা ছেলেকে দিয়ে আঁকিয়ে দু'ঘন্টা ট্রেনে চেপে প্যারিস এসে হকি মাঠে ভারতকে সমর্থন--- অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য এবং অবশ্যই অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতা !

হকি মাঠে মিডিয়া বক্সের পেছনে গ্যালারীতে হলদে শাড়ি পরে ব্রাউন সানগ্লাস চোখে জাতীয় পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলিউডের গ্ল্যামার গার্ল তাপ্সি পান্নু। সাথে লাইফ পার্টনার ডেনিশ শাটলার মাথিয়াস বো। ৩৭ বছরের এই বলিউড তারকাকে কাছে পেয়ে সেল্ফি তোলার জন্য এগিয়ে যান অনেকেই। তাপ্সি প্যারিসের বিভিন্ন খেলা দেখেছেন অলিম্পিক রৌপ্য জয়ী মাথিয়াসের সাথে। শুধু তাপ্সি একা নন, ভারতীয় হকির কিংবদন্তি সব খেলোয়াড়কেও ভিভিআইপি বক্স আলো করে বসে থাকতে দেখা গেছে। এ চিত্র অবশ্য স্বাভাবিক হকিতে। এই খেলাটাই তো এখন পর্যন্ত অলিম্পিকে ' শান' ভারতের।

হকিতে টোকিওর পর প্যারিসেও ভারত পেলো ব্রোঞ্জ। টানা দু'টি অলিম্পিকে। অল্পের জন্য সেমিফাইনালে হার ভারতের পদকের রং পরিবর্তন করাতে না পারলেও, পদক জয় অব্যহত রয়েছে। এবারের আসরে মোট ছয়টি পদক এসেছে। আটটি পদক হাতছাড়া হয় গোড়ায় এসে। সংখ্যাটা চার বছর পর লস এঞ্জেলসে ডবল ডিজিটে নিতে প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করতে হবে।

প্যারিস প্যারা অলিম্পিক
ভারতের সর্বকালের সেরা

বিপ্লব কুমার চন্দ

গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ। প্যারিসে অনুষ্ঠিত এই আসরে হতাশ করেছিল ভারতীয় অ্যাথলেটরা। টোকিও অলিম্পিক থেকে পদক কম পেয়ে ৭১ তম স্থানে শেষ করেছে ভারতীয় দল। সেই জায়গায় প্যারিস প্যারা অলিম্পিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সেরা সাফল্য তুলে আনলো ভারতীয় প্যারা অলিম্পিয়াডরা। ৭টি সোনার পদক সহ ২৯ টি পদক নিয়ে এবার ভারতীয় দল দখল করল ১৮ তম স্থান। ২০২০ সালে টোকিও প্যারা অলিম্পিকে ভারতীয় দল ১৯ টি পদক জয় করেছিল। যেটা ছিল ভারতের সর্ব্বোচ্চ ইতিহাস। কিন্তু এবার সদ্য সমাপ্ত ২০২৪ প্যারা অলিম্পিকে ভারতীয় দল সমস্ত রেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস রচনা করে। এবছর ভারতের ঝুলিতে আসে ৭টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ এবং ১৩ ব্রোঞ্জ পদক। সবমিলিয়ে টোকিও থেকে প্যারিসে ভারতীয় দল ১০ টি বেশি পদক জয় করেছে।

১৯৬০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্যারা অলিম্পিকের ইতিহাসে এটাই ভারতের সর্বকালের সেরা ফলাফল। ইতিহাস সৃষ্টিকারী এবারের এই আসরে ভারতীয় দল প্রথমবার ট্রেক ইভেন্টে পদক জয় করে। মোট পাঁচটি ইভেন্টে ভারতীয় দল জয় করে ২৯ টি পদক। যার মধ্যে তীরন্দাজিতে একটি সোনা এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক। অ্যাথলেটিক্সে চারটি সোনা, ছয়টি রৌপ এবং সাতটি ব্রোঞ্জ পদক। ব্যাডমিন্টনে একটি সোনা, দুইটি রৌপ এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদক। শুটিংয়ে একটি সোনা, একটি রৌপ এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদক। অন্যদিকে জুডোতে আসে একটি ব্রোঞ্জ পদক। সব মিলিয়ে পাঁচটি ইভেন্টে ভারতীয় দলের সংগ্রহ ২৯ টি পদক। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ভারতীয় দল প্যারা অলিম্পিক আসরে সর্বমোট ১৬টি স্বর্ণ, ২১ রৌপ এবং ২৩ টি ব্রোঞ্জ পদকসহ ৬০ টি পদক জয় করে ৫৬ তম স্থানে রয়েছে। যেখানে আমেরিকা ৮৪৪টি স্বর্ণ, ৭৭৮টি রৌপ, এবং ৭৬৬ টি ব্রোঞ্জ পদক সহ মোট ২৩৮৮ টি পদক নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে।

সর্বকালের ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভারতীয় প্যারা অলিম্পিয়ানরা সেরা সাফল্য নিয়ে দেশে ফিরেছেন। এদিকে এবারের এই সেরা সাফল্যের জন্য প্যারা খেলোয়ারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ক্রীড়া মন্ত্রী মানসুখ মান্ডব্যসহ গোটা দেশবাসী। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক পদক জয়ী খেলোয়াড়দের জন্য ঘোষণা করেছে বিরাট অর্থমূল্য পুরষ্কার। স্বর্ণপদক জয়ী খেলোয়ারদের ৭০ লক্ষ টাকা, রৌপ পদক জয়ীদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্রোঞ্জ পদক জয়ীদের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা করে অর্থ মূল্যের পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যার কারণে প্রত্যেক খেলোয়াড় এবং অভিভাবকরা অভিভূত। ভারতের প্যারা অলিম্পিক ক্রীড়াবিদরা অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজেদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে বিশ্ব দরবারে নিজেদের তুলে ধরেছেন। তৈরি করেছেন নতুন সাফল্যের ইতিহাস। এরফলে আগামী দিনে বিশ্ব ক্রীড়া আসরে ভারতীয় প্যারা অলিম্পিয়াডদের আগ্রহ যেমন বাড়বে, ঠিক তেমনি বাড়বে সাফল্যের পরিসংখ্যান।

ত্রিপুরার হকি

লক্ষ্মণ দেব

৪০ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর ৪ ভাগের ৩ ভাগের কাছে 'হকি' নামক শব্দটুকু নিছক অর্থহীন। আর ১ ভাগ লোক হয়তোবা জানেন হকি একটা ছাতির বাঁটের মত লাঠির খেলা। পূর্বোত্তরের অধিকাংশ রাজ্যে হকিই একমাত্র জনপ্রিয় খেলা। আজ পূর্বোত্তরের ছেলে-মেয়েরা ভারতে হকিকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সদ্য প্যারিস অলিম্পিকে তৃতীয় স্থান দখল করেছে ভারত। তা গোটা বিশ্বের কাছে ভারতকে আবারও গৌরবান্বিত করেছে।

১৯৮৯ সালে হকি খেলা শুরু করি। ঐ সময় রাজ্যে কয়েকজন ভালো হকি খেলোয়ার ছিলেন। অনেকে সমালোচনা করেন হকিতে ত্রিপুরা অনেক পিছিয়ে পড়ছে। এর থেকে উত্তরনের পথ হলো রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের একান্ত তদারকি, আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রাক্তনীদের দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসে সুপরামর্শ প্রদান। আর্থিক সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দিতে হবে। এটাই ত্রিপুরার হকির উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি।

হকি খেলাটা ভলিবল, ফুটবল বা ক্রিকেটের মতো সহজ খেলা নয়। হকির স্টিক ধরা ও তার ব্যবহারের কৌশল শিখতে হয়। ছাতির বাঁটের মতন হকি স্টিকগুলি এবং গোলকিপারের আনুসঙ্গিক সামগ্রীগুলি ব্যয়বহুল। তাই গ্রামেগঞ্জে, মাঠেঘাটে হকি খেলতে তেমন দেখা যায় না। ফলে জনপ্রিয়তাও পায় না। তাছাড়া এই খেলার প্রাক্তণ খেলোয়ারদের সরকারি চাকরির সুযোগ হয়নি। হকির জন্য উপযুক্ত মাঠও ত্রিপুরায় নেই বললে চলে। তবুও এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজেদের আন্তরিক উদ্যোগ, আর্থিক দান, শ্রমদানে ত্রিপুরায় হকিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দুরন্ত প্রচেষ্টা করছেন নবযৌবণেরা। গঠিত হয়েছে 'হকি ত্রিপুরা' সংস্থা। বর্তমানে পুলিশের ডি জি, এ আই জি'র মতো পদাধিকারিরাও এতে শামিল হয়েছেন। তা রাজ্যে হকিকে এক নতুন দিশা দেখাবে এ ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।

ত্রিপুরার ৮টি জেলার প্রতিটি প্রান্তেই হকি অনুশীলন হয়। তবে অনিয়মিত। কারণ সরকারি কোচ, হকি উপযুক্ত মাঠ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব। তবে প্রতিযোগিতার প্রাক্কালে সবগুলি জেলাতেই অল্প কয়েকদিন অনুশীলন শেষে জেলা দল গঠন করা হয়। এই দল সুকল স্তর বা রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

মোহনপুর ব্লকে মাঠের অভাব নেই। কিন্তু উপরিউক্ত বর্ণিত প্রতিবন্ধকতাগুলি এই ব্লক এলাকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিভা ও দক্ষতা প্রদর্শনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিরানীয়া ব্লকের এন আই টি মাঠে ও খুমুলুঙে নিয়মিত অনুশীলন হয়। কারণ কয়েকজন জাতীয়স্তরে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ও সুকান্ত গোস্বামীদের মতো কয়েকজন হকি শুভাকাঙ্খী ব্যক্তি সর্বদা উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে চলেছেন। সদর ব্লকের ২টি সেন্টার--- একটি ড্রপগেট পুলিশ হকি গ্রাউন্ড ও আরেকটি এ ডি নগর হকি সেন্টার। পুলিশ হকি গ্রাউন্ডে সরকারি কোচ আছেন। দীর্ঘ পুরনো সেন্টার এটি। জাতীয়স্তরে অংশগ্রহণকারী অনেক বর্তমান ও প্রাক্তন খেলোয়াড়ে পরিপূর্ণ সাজানো হকি বাগান। বর্তমানে ভালো খেলোয়ার নয়ন সরকার, রণবীর সরকার, বিবেক রায়, দেবজিৎ দাসরা।

অন্যদিকে এ ডি নগর হকি সেন্টারের আয়ুষ্কাল ২ বছর। গত বছর পশ্চিম জেলা সুকল অনুর্ধ ১৭ প্রতিযোগিতায় ৫ জন নির্বাচিত হয়েছেন এই সেন্টার থেকে। এ ডি নগর সেন্টারের প্রতিভাবান খেলোয়াড় অনুপম শুক্ল দাস, পিন্টু দাস, সম্রাট সাহা, মোহিত দাস, জয় পাল, আকাশ দেব, উদয় ঘোষ প্রমুখ।

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিতার অভাব নেই। যদি সরকারি সহযোগিতা ও আপামর ক্রীড়াপ্রেমীরা তাদের দুই হাত উজাড় করে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন তবে মণিপুর, নাগাল্যান্ডের মতো ত্রিপুরায়ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রবল। যে কোন বিভাগে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছোতে চাই দীর্ঘমেয়াদী যোজনা। অনুর্ধ ১২, ১৪ ও ১৫ বছর যে কোন ক্রীড়া ইভেন্টের বুনিয়াদি স্তর। ত্রিপুরা স্পোর্টস সুকল বোর্ড অনুর্ধ ১৭ বছর বালক বিভাগে জাতীয় স্তরে দল পাঠায়। এতে বালিকা বিভাগ বঞ্চিত থাকে। এই বুনিয়াদী স্তরকে তুলে ধরতে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, ত্রিপুরা সুকল স্পোর্টস বোর্ড, হকি ত্রিপুরা সংস্থার কোনো বিশেষ উদ্যোগ নেই। অর্থাভাব, লোকবল অভাব, উদ্যোগের অভাব, অবহেলা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অনাদরের ফলে ত্রিপুরার হকি জনপ্রিয়তার তলানিতে অবস্থান করছে। নবগঠিত 'হকি ত্রিপুরা' সংস্থাই পারে উল্লিখিত সমস্যাগুলির সমাধানের পথ সন্ধান করে সম্মিলিতভাবে দীর্ঘমেয়াদী যোজনা গ্রহণ করে ত্রিপুরার হকিকে সাফল্যের শীর্ষে ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে যেতে।

মডার্ণ ক্লাবের কার্যকরি কমিটি- ২০২৪

সভাপতি	: শ্রী সজল চক্রবর্তী
সহ-সভাপতি	: শ্রী সমর রায়
	শ্রী স্বপন দত্ত
সম্পাদক	: শ্রী সঞ্জিত নাহা (লিটন)
সহ-সম্পাদক	: শ্রী দেবব্রত ভৌমিক
	শ্রী দেবারুণ দত্ত
কোষাধ্যক্ষ	: শ্রী তপন রক্ষিত
সহ-কোষাধ্যক্ষ	: শ্রী পার্শ্বনাথ ধর
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	: শ্রী আশিস দেব
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক	: শ্রী রাণা সাহা
ক্রীড়া সম্পাদক	: শ্রী প্রণব পোদ্দার
প্রচার সম্পাদক	: শ্রী মিন্টু দেব
অফিস সম্পাদক	: শ্রী উত্তম ধর

ক্লাবের কার্যকরি কমিটির সদস্য

শ্রী সুবীর দত্ত
শ্রী আশিস রায়
শ্রী রামকৃষ্ণ বণিক
শ্রী পার্থ চক্রবর্তী
শ্রী বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত
শ্রী চন্দন কর
শ্রী অলক চক্রবর্তী
শ্রী অলক দে
শ্রী বিদ্যুৎ সেন
শ্রী বাপী দত্ত
শ্রী পার্থ সারথি দেব
শ্রী জয়ন্ত ভদ্র
শ্রী নিতাই পাল

ক্লাবের উপদেষ্টা কমিটি

শ্রী মৃণালকান্তি দেবরায়
শ্রী সুবীর দত্ত
শ্রী হিমাদ্রী সাহা
শ্রী স্বরাজ দেব
শ্রী শেখর সি দত্ত
শ্রী গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী
শ্রী ফণীন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীমতী স্বপ্না দাশগুপ্তা
শ্রী রতন দেব
শ্রী সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী
শ্রী অপু বিশ্বাস
শ্রী গোপাল দত্ত
শ্রী বিদ্যুৎ চৌধুরী
ড. জয়ন্ত পাল
ডা:বাসুদেব রায়
শ্রীমতী শিপ্রা রায়
শ্রীমতী কনিকা চক্রবর্তী
শ্রীমতী গায়েত্রী চক্রবর্তী
শ্রী উত্তম রায়
শ্রী অসীম বিশ্বাস
শ্রী প্রদ্যুৎ সেন
ডা: মণিদীপ চক্রবর্তী
শ্রী পান্নালাল চক্রবর্তী
শ্রী সন্তোষ ঘোষ
শ্রীমতী মিতা চক্রবর্তী
শ্রী সুব্রত ভৌমিক

মডার্ণ ক্লাবের দুর্গা পূজা কমিটি- ২০২৪

সভাপতি	:	শ্রী দেবজিৎ বিশ্বাস (অপু)
সহ-সভাপতি	:	শ্রী পান্নালাল চক্রবর্তী
		শ্রী স্বরূপ চক্রবর্তী
		শ্রী সুব্রত ভৌমিক
		শ্রী অসীম বিশ্বাস
		শ্রী প্রদ্যুৎ সেন
		শ্রীমতী স্বপ্না দাশগুপ্তা
সম্পাদক	:	শ্রী আশিস দেব
সহ-সম্পাদক	:	শ্রীমতী রুমা দে
		শ্রী নিতাই পাল
		শ্রী ধৃতিমান চক্রবর্তী
		শ্রী জয়ন্ত ভদ্র
		শ্রী মনোজ দেব
		শ্রী অপূর্ব দত্ত
কোষাধ্যক্ষ	:	শ্রী চন্দন কর
সহ-কোষাধ্যক্ষ	:	শ্রী দেবারুণ দত্ত
সদস্য	:	শ্রী বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত
		শ্রী উত্তম রায়
		শ্রী সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী
		শ্রী শেখর ভট্টাচার্য
		শ্রী অলক চক্রবর্তী
		শ্রী শ্যামল চৌধুরী
		শ্রী অলক দে
		শ্রী বাপী দত্ত
		শ্রী দেবব্রত ভৌমিক
		শ্রী উত্তম ধর
		শ্রী পার্শ্বনাথ ধর
		শ্রী নেপাল সেন
		শ্রী অনির্বান চক্রবর্তী
		শ্রী মিন্টু দেব
		শ্রী কল্লোল পাল
		শ্রী পিনাক চক্রবর্তী
		শ্রী রানা সাহা
		শ্রী দীপঙ্কর রায় (মান্তু)
		শ্রী প্রণব পোদ্দার
		শ্রী শুভঙ্কর দেব
		শ্রী শুভঙ্কর ভট্টাচার্য
সদস্যা	:	শ্রীমতী গায়েত্রী চক্রবর্তী
		শ্রীমতী রীতা দেবরায়
		শ্রীমতী শিপ্রা রায়
		শ্রীমতী অঞ্জনা চক্রবর্তী
		শ্রীমতী মিতা চক্রবর্তী
		শ্রীমতী রিনা কপালী
		শ্রীমতী শিল্পী মজুমদার (ধর)
		শ্রীমতী বেলা দেব
		শ্রীমতী দেবপ্রিয়া বণিক (দত্ত)
		শ্রীমতী সন্ধ্যা পাল
		শ্রীমতী লক্ষ্মী চৌধুরী (দত্ত)
		শ্রীমতী অদিতি চক্রবর্তী
		শ্রীমতী সঞ্চিতা দত্ত
		শ্রীমতী রূপা বৈদ্য
		শ্রীমতী সোমা দত্ত

তথ্যচিত্রে মডার্ণ ক্লাব'

২০২৩ সালে ক্লাবের পূজা মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা

প্রদীপ জ্বেলে হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সূচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রীসহ অতিথিরা

২০২৩ সালের 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশের পর মুখ্যমন্ত্রীসহ ক্লাব কর্মকর্তারা

হীরক জয়ন্তী বর্ষে খেলাধুলার উন্নয়নে প্রতিবেশী ক্লাবগুলোকে অর্থ সাহায্য তুলে দেয়া হয়

২০২৩ সালে পূজা মণ্ডপে ক্লাবের মহিলা সদস্যদের সাথে কর্পোরেটর অভিজিৎ মৌলিক

হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন সূচনা অনুষ্ঠানে এলাকার প্রবীণদের সংবর্ধনা

ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষ সূচনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীসহ অতিথিরা

হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন সূচনা অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পীদের পরিবেশনা

হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

ক্লাবঘরে রাখী বন্ধন উৎসব

হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে কর্পোরেটর সম্পা সরকার (চৌধুরী)'কে সংবর্ধনা

ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি মিহির চন্দ্র চক্রবর্তীর শেষ বিদায়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন ক্লাবের সাংস্কৃতিক শাখার শিল্পীরা

ক্লাবের একটি সভায় উপস্থিত প্রবীণরা

ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় শিশুরা

২০২৪ সালের দুর্গা প্রতিমা তৈরির আগে কাঠামো পুজা

আঁকাবুকি

অদ্রিজা দত্ত, নবম শ্রেণী, শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল

আদ্রিকা দত্ত, পঞ্চম শ্রেণী, শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল

অয়ন্তিকা ব্রহ্ম, পঞ্চম শ্রেণী, সন্ট পলস্ স্কুল

শ্রেয়া চৌধুরী, সপ্তম শ্রেণী, শিশুবিহার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

দেবরাজ বিশ্বাস, তৃতীয় শ্রেণী, স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুল

RUMA'S RUPTAN
BEAUTY ZONE & ACADEMY
A complete Professional Touch-Up
PROJECT OF
MUA RUMA BANIK
Ph: 7005438815
Nagarjala, Near Modern Club
Prop: Ruma Banik

Opening Soon
Limited Seats
Your ward our commitment
Premium
LiTTLE DREAM
Baby Care Centre
এখানে অতি যত্ন সহকারে দায়িত্ব নিয়ে
বাচ্চাদের রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়
More info Call Us
94364 82221
94364 82223
Prataproy Sarani, Krishnagar
Agartala, Tripura West

ত্রিপুরা সরকার

রাজ্যের সকল ভোক্তাদের প্রতি
ত্রিপুরা সরকারের শারদ অভিনন্দন-

ক্রেতা হিসাবে আপনার অধিকারগুলো প্রয়োগ করুন

- নিরাপত্তার অধিকার
- তথ্য জানার অধিকার
- পছন্দ করার অধিকার
- বক্তব্য শোনানোর অধিকার
- প্রতিকার চাওয়ার অধিকার
- ক্রেতা সচেতনতার অধিকার

ভোক্তা কমিশনের আর্থিক পরিধি

- জেলা ভোক্তা কমিশন : ৫০ লক্ষটাকা পর্যন্ত
- রাজ্য ভোক্তা কমিশন : ৫০ লক্ষ টাকার বেশি এবং ২ কোটি টাকা পর্যন্ত
- জাতীয় ভোক্তা কমিশন : ২ কোটি টাকার বেশি যে কোন অর্থমূল্য

ক্রেতা হিসাবে আপনি ক্ষতিগ্রস্থ হলে ভোক্তা আদালতে প্রতিকারের জন্য অভিযোগ দায়ের করুন

ন্যাশনাল কনজিউমার হেল্প লাইন
১৯১৫

ই-ফাইলিং পোর্টাল
www.edaakhil.nic.in

জাগো গ্রাহক জাগো

ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

শারদীয়
শুভেচ্ছা
উৎসবের দিনগুলি হউক
আনন্দ মুখরিত
কালিকা
KALIKA
Jewellers
জুয়েলার্স
শুদ্ধতার স্বর্ণমন্দির
Hariganga Basak Road,
Agartala, Tripura, Ph: 0381 2387479 / 2385361

বিদ্যুৎ পরিষেবাকে অক্ষুন্ন রাখতে সময় মতো বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করুন

বিলিং তারিখ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বিদ্যুতের বিল
নিগমের ক্যাশ কাউন্টারে এসে পরিশোধ করলে ৩% ছাড় এবং
অনলাইন / ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিশোধ করলে ৪% ছাড় পাওয়া যায়

বিলিং তারিখ থেকে ১৫ দিন পরে বিল প্রদানে আরও
অতিরিক্ত ২% বিল পরিশোধ করতে হয়

আপনি কি আপনার বাড়ি / প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের
লোড সম্পর্কিত বিষয়টি বিদ্যুৎ নিগমকে
জানিয়েছেন ? বৈদ্যুতিক পরিষেবা ও সুরক্ষার স্বার্থে
আজই এ বিষয়ে নিগমকে অবহিত করুন।

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ জানাতে
১৯১২ নম্বর ছাড়াও নিম্নোক্ত মাধ্যমগুলো ব্যবহার করতে পারেন

24/7 SERVICE

Complaint Registration Sources other than "1912"

WhatsApp 9863596081
Twitter @TSECLCCare
Bidyut Bandhu App
Web Portal www.tsecl.in
IVRS
Cell 6033132082

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

Longtharai
For Human Forever
শারদীয় শুভেচ্ছা
লংতরাই®
Chicken Masala
Meat Masala
Garam Masala
Longtharai®
Kocchi Ghani
MUSTARD OIL
লংতরাই
Longtharai
GHEE
Longtharai
Soyabean Oil
www.longtharai.in